আলেয়া হ্রদ

জয় গোস্বামী

অভিমান

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৭

প্রকাশক : গৌতম চৌধুরী
অভিমান, ১৬/৩১/২ কৈপুকুর লেন
হাওড়া-৭১১১০২

মুদ্রক : মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

আনন্দকে

সূচী

জরা

মূর্ছা

গৃধিনী

ফোয়ারা

ছবিমামা, পথে চলো, মেতে গেছে সবুজ ফোয়ারা !
কালো যে-ঋতুরা আর সাদা যারা সকলেই পাতালের থেকে
শুঁড় তুলে দেয় জলতলে। এতে যে আকাশে আজ
ঘনতর নরকের রং লেগে যায় সে কথা কি
        বাগানের নরম থোয়ারা
ভুলে যাবে ? কিছু মনে রাখবে না অত সব পাথরপরীর
খোলা শরীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ?
যদি জলতল থেকে উঠে কোনো কুমারী জরায়ু
মর্মর দেহের মধ্যে গিয়ে ফের এদের কাউকে ঋতুমতী
        করে তোলে, তাহলে আবার তার প্রতি
আমি যাবো, আমার সমস্ত বীজ ভরে দেবো রাত্রিভোর
        ছবিমামা, আমার শরীর
কখনো সারবে কি আর ? যদি পথে পথে এত মেতে গেছে
        সবুজ ফোয়ারা, ছবিমামা
তাহলে বর্ষারা আর আমাকে ধরবে কবে ঘননরকের জাল পেতে !

রোমাঞ্চকাহিনী

আমি বললাম ওকে বেরোবো না, আজ বিকেলে বাড়িতে থাকবোই।
যদি সময় পাও তো চলে এসো ; এই ঘড়িকে ধরেছি মুঠোতে ;
সব কাঁটা ও সংখ্যা তুলে নিই। যেন আঁচল দিও না লুটোতে।
লাল টকটকে মুখ ডায়ালের, তাকে মাথায় ধরেছে যে-টিলা
তার একধারে শুধু শালবন আর অন্য দিকটা ফাঁকাই—
আমি সত্যি কখনো তাকাই নি ; ঘড়ি, তুমি আছো, আজ তাকাই ঃ

বাঁকা দিগন্ত ফেটে বেরোচ্ছে, ও কী একঝাঁক কালো-সাদা ঘোড়া !
ঝুঁকে প্রায় নুয়ে আছে সহিসেরা, আর পিঠে ওগুলো তো বর্শাই—
মাঝে একজন হাত তুলেছে—তার পা দুটো বাঁকানো—এটিলা ?
সব চালাঘরগুলো জ্বলে যায় পিঠে সাঁৎ করে এসে লাগে ছোরা
পাশে বধূটি এখনো ছুটন্ত ভাঙ্গা কপালের থেকে খুন ঝরে
গিয়ে আছড়ে পড়েছে আশ্রমে, ওকে তুলে নেয় লোভী সন্তরা

আমি বললাম আজ পড়াবো না। নয় ঘরে আজ পড়ে থাক বই।
সেই জ্যান্ত হলো তো ওরা সব ? আমি কী করে এখন ঘর ছাই ?
জানো পড়াতে পারি না ইতিহাস, তবু এই প্রচন্ড গরমে
তুমি খুলে দিলে চোরাকুঠুরি, যাতে পিষে যাই ভারী খড়মে।
সেই গানটা কি পুরো মনে আছে ? সেই 'মৌমাছি ওই গুঞ্জরে,
ওই গুঞ্জরে'—সেই জায়গাটা ? তবে ওদিকে যেও না তাকাতে—
রাতে আরো রোমাঞ্চকাহিনী নয় বলা যাবে রানা ডাকাতের।

খুলি

ফলের ওপরে পীত
রঙ, আমি তার গায়ে সিরিঞ্জ বেঁধাতে
ফুটে ওঠে রক্ত এককণা।
দেখে, ইহশরীরে কিঞ্চিৎ
মমতা আরম্ভ হয়। ফল কহে 'তুমি আজ দেখেও দেখো না—
তার ত্বক সরিয়ে দিয়ে দেখি দশ হাজার সাতশ কোটি
জীবকোষ ফলের মেধাতে···

ফল নয়। মাঠের মধ্যে পড়ে আছে খুলি—
আজ তার বর্ণ শ্বেত।
চারপাশে নরম কাদা ঘাস। এ-চোখের
ফুটোর ভিতর কোনো ইঁদুর আশ্রয় ভেবে ঢোকে
বেরোয় ও-চোখ দিয়ে। কিছুটা দূরেই গমক্ষেত।
খেলছে শেয়ালের দুটো ছানা।
আমারই একখানা হাড় মুখে করে পালালো ছোটটি।
কিন্তু আরো তো ছিল! কটা যেন? পুরো দুশ ছয়।
খুলি কহে বাপু, তুমি নয়
আলাভোলা, দেখলে না গাঁয়ের সে হাল!
কিছু তো হায়নারা খাবে, আর কিছু খাবে তো শেয়াল—
পিঁপড়েরা মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাতলো বিছানা
তখনো বোবাটি রইলে। আজ বাপু কেন মিছা আকুলি বিকুলি!'

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ বুজে ফের চোখ খুলি ঃ
শূন্যে চাঁদ—আজ তার বর্ণ বড় শ্বেত।
দূরে মরে যাওয়া বাড়ি, গায়ে ঝোপ, নুয়ে পড়া বেত।
ছিন্ন কামিজখানা দেখা যায়, বাঁশের হাতলওয়ালা ছাতা
কালো কাপড়ের মধ্যে ঘর করে আরশোলা, তার ওপর উড়ে আসে পাতা
আরো দেখে ফেলি আমি— উল্টে আছে এক পাটি ক্যাম্বিসের জুতো।

মা দিয়েছিলেন যেটা—সেই মন্ত্র জাগানো মাদুলি—
সেটা কোনখানে আছে ? আর চোখে পড়ে না কিছু তো।
বনের ওপর দিয়ে শুকনো হাওয়ার ঝাপটা মুঠো করে ধরে
শূন্যপথে ফিরে চলি। ওদিকের মাঠে একা পড়ে
চাঁদের আলোয় জ্বলে আমারই মাথার সাদা খুলি···

কাগজে বসাই তবে, অনুবাবু। আরো একবার ঐ আধমরা গাছের তলা থেকে
তোমাকে বসাই এসো সাদা কাগজের মধ্যে। সবটা না হোক, অন্ততঃ হাঁটার
ভঙ্গী, কিংবা ঐ হাত নেড়ে বারণ করাটা
বসাতে সম্মতি দাও। চুপচাপ দুপুর চলছে। মাসীমা কি শুয়েছেন ?
চমকে দেবো, উঠে যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ খুপরিতে
পায়রা ঝটপট করলো, খুব নিচু ভল্যুমে রেডিও, মাথা ময়দা স্তুপ করে
রেখেছো একপাশে, অনুবাবু, সারামুখে ঘাম !
তাহলে ঘামের ফোঁটা বসিয়ে দি এইখানে ? বসিয়ে দি মিণ্টু আর
ঝুমুকে স্টেশন থেকে টা টা ?
বাস থেকে নামার পর হোঁচট বা চটিছেঁড়া ? বসাই চায়ের ভাঁড় ?
নোনতা বিস্কুটগুলো বাজে ?
না দিগন্ত বসাবো না, মেঘ নয়, ধানক্ষেত পড়ে থাক বাঁয়ে
বরং দাঁত উঁচু লোকটা—যে প্রায় আকাশে চড়ে আমাদের তিনটে নারকেল
পেড়ে দিলো ঝুপঝাপ, তাকে লিখি, যে বউটি মুড়ি দিলো কাঁসার বাটিতে
নি আসি তাকেও—কিন্তু 'অতগুলো খেতেই পারবো না'
এই 'খেতেই' বলবার টান আনতে পারছিনা কিছুতেই। মাথা
হেলিয়ে দাঁড়ানো টিউকলে
ঝুঁকে জল খাওয়া আর চটিতে সেফটিপিন, পিন ফুটে আঙুলে রক্ত,
সাবধানে শুষে নেওয়া চুণ……
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাত্রে যেতে যেতে একদিন
জন্তুর শরীরে গুলি ঢুকে গেছে ; সবসময় ঝরে পুঁজ ; অথচ সে উঠে যাচ্ছে
সিঁড়ি দিয়ে, চমকে দেবে, বাড়িতে কেউ নেই,
ছাদ থেকে আলো এসে সমুখে পড়েছে অল্প। দরজা কি এখনো খোলা ?
অনুবাবু, অনু, বুকের ঢেউদুটি এত ছোটো !
শ্বাস দিয়ে বাজিয়েছি ঐ শাঁখ, আর চুল মুঠো করে রেখেছিলো ততক্ষণ
রোগা রোগা সাদা আঙুলেরা
তাতে অল্প নখ—না, না, এসব না। আজ এই আধমরা গাছের তলা থেকে
বসাই পরীক্ষা সামনে, চোখে কালি, হনু জেগে উঠেছে দুগালে

বসাই পেন্সিল দিয়ে কপালের ঝুরো চুল সরানো—বসাই
কাগজে সবশেষে এক স্নানহারা জন্তুর ক্ষত, রক্তে লাল হওয়া জল
আর ভোরবেলা
সকলে জাগার আগে লোকালয় ছেড়ে
নিঃশব্দ পালানো তার লিপিবদ্ধ করে রাখি,
অনুবাদ, যদি পারো প'ড়ো খুঁজে নিয়ে······

সারিগান

ভেসে আসতো সারিগান, শুনতাম না। আজকে তারা দোলনার পিছনে
লুকোতে গিয়েও শেষে দেখালো কী চমৎকার পলক ফেলার ভুল :
পিঠের ধনুকে
গোসাপ ঝুলিয়ে আমি পা দিলাম বেড়াঘেরা উঠোনে—'কই রে
একবার ইদিকে আয়'—কে আসবে ? ভেসে আসতো সারিগান
দোলনার পিছনে আজকে তারা
লুকোতে পারেনি তাই চোখে বালু, কাঁকরেও ছেয়ে গেছে পথ।
কাঁকরই সাক্ষাৎকার এনে দিলো সামনে ফের, বেঁকে গেছে পিচরাস্তা
বাস যাবে
দু মাইল দূরেই নোকারি
তারপর ঘুঘুডাঙা, তিনদিন আগের দাঙ্গা থেমে যাওয়া মাঠ এখন
কথাটি বলছে না, বাস যাবে
কাঁকরই টকটকে লাল দংশন মনে করালো গলার উপরে, কাঁকরই তো
ফিরে দিলো
বোসের ভাগ্নীর হাতে সারাদিন ধরে ব্যথা কোথাও ডাক্তার নেই
বাস যাবে দু মাইল দূরের নোকারি
ফিরে আসছে, একপলক চমৎকার চোখের ভুল হাতে নিয়ে ফিরে আসছে
ফের সারিগান
ডাক্তারখানার গেটে কাঁকর বিছানো আর তারও কতদিন পর
একসঙ্গে নৌকোয় উঠলাম
মাত্র তিন পয়সা করে ভাড়া নিয়েছিলো কিন্তু কয়েকটা চালাঘর পেরোতেই
আবার আবার সেই কাঁকর ছড়ানো পথ, রক্তাভ কাঁকর !
যা পুনশ্চ এনে দিলো খড়ের ছাউনির মধ্যে চায়ের দোকান, আনলো
বড় গাছটার নিচে দল বেঁধে জিরোনো ;
রাস্তার দুপাশে শিলা জড়ো করা। ওগুলো কি চাঁদ থেকে আনা ?
চাঁদ এইরকমই উঠতো পড়তে যাবার আগে মুখার্জিবাড়ির পাশ দিয়ে
ফাটা ছাদ, শ্যাওলাধরা—তারই কাছ থেকে
ভেসে আসতো সারিগান, শুনতাম না, আজকে তারা দোলনার পিছনে

লুকোতে গিয়েও দেখি লুকোলো না, পরিবর্তে ঝোপ থেকে পালানো শুয়র
বেঁধালো আমাকে দিয়ে, আগুন জ্বাললাম রাত্রে, ডানদিকে হাঁড়িয়ার ভাঁড়
গোল হয়ে বসে সব, শিকে গাঁথা শুয়রটা লাল—তারও কত আগে
উঠোনে ফিরলাম আমি পিঠের ধনুকে ঝুলছে সোনার গোসাপ
'কই রে ফুল্লরা !—'ফুল্লরা কে ? চিনি না তো !

কিন্তু ঐ চালা থেকে সাঁওতালী পোষাকে
যে মেয়েটা বেরিয়ে এলো সে তো

মুখাঁজিবাড়িতে থাকতো, পড়ে ফিরতাম আমরা, ফাটা দেয়ালের পাশে চাঁদ !

আজ আবার

তারই আড়াল থেকে ফিরে আসছো সারিগান,

শুনতে পাচ্ছি, দোলনার পিছনে······

শিকার

ভোরেও ফিরিনি, ঐ টালির ছাদের নিচে দূরে থেকে ধোঁয়া দেখা দিলে
ভেবেছি রাত্তিরে থেকে যাবো
মেঝে নেই, এ বাড়িতে শেষরাত্রে মেঝে নেই। অন্ধকার, তবে কি শুলাম এসে
জঙ্গলের ধারে ?
জঙ্গলই তো ! ছোটো বড় বুনো ঝোপ সরিয়ে বাড়ালো মুখ কুকুর—শ্বদাঁত।
ও বুঝি কম্বলসুদ্ধ তুলে নেবে আমাকে মুখেই আর একছুটে পেঁছবে

জঙ্গলে

আমিও তো একদিন বনে বনে পালিয়ে চলেছি রাত্রিবেলা
জামা ছিঁড়ে আঘাতে বাঁধন
পিছন ছাড়েনি শুধু ফোঁটা ফোঁটা গরম কুমকুম
শুকনো পাতায়, ঘাসে, কাদার উপরে, ঠিক টপ্ টপ্ পা ফেলে চলেছে
এপাশ ওপাশ থেকে দুটো একটা শেয়াল বেরিয়ে
চেটে নিচ্ছে স্বাদু ফোঁটা, তাড়া দিলে ঢুকে যাচ্ছে ঝোপের ভিতর
ভোরেও ফিরিনি, এই জঙ্গলে তো সন্ধ্যে হয় শীগগীর। ওদিকে চাইলে
জ্বলজ্বলে জোড়াচোখ সরে যায় পাতার আড়ালে
পিছনে খসখস শব্দ, পাখিরা চিৎকার করছে 'পালাও'—কোথায়
কোথায় বা পালাবো আর ? ছাদে নেই, কুমকুম তরল হয়ে
কবে ঢুকে পড়েছে শরীরে—
সামান্য কাঁটায় লাগলে বেরিয়ে আসবে—দৌড়োও জঙ্গল ছেড়ে
সপাটে আছড়ে পড়া ছেড়ে
দৌড়োও বাকিটা জামা ছিঁড়ে আরো শক্ত করে আঘাতের পটি
দৌড়োও যতটা গেলে ফল্গুদের হাতে বোনা তাঁত
সড়কের পাশ থেকে নেমে গেছে ফিতে রাস্তা, পাকাবাড়ি ও গ্রামে একটাই
সেটা ফল্গুদের নয়। পাটকাটির বেড়ার ওপাশে ধোঁয়াওঠা
উনুন নামাতে এলো ভারী মুখ। এক ডাঁই বাসন নিয়ে
উঠছে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে
পুকুরের পাশের কাদায়
আমার পায়ের ছাপ দেখেনি তো ? ভয় পাবে। তোমার খাবার দাগ

শুকনো পাতায় ঢাকা আছে। যে এনেছে রেকাবিতে বাতাসা ও জল
ভেবো না একবারও তাকে। কোথাও টালির ছাদে দূরবর্তী ধোঁয়া দেখা দিলে
ভেবো না রাত্তিরে থেকে যাবে
মেয়ে নেই, এবাড়িতে একটিও মেয়ে নেই, সুতরাং ভেবো না যে শুয়ে আছো
মাত্রই বারান্দার ধারে!
তলাকার কাঁটাঝোপ সরিয়ে বাড়াবে মুখ বিরাট কুকুর শেষরাতে
তবে আর ফিরতে পারোনি ভোরে, শরীরে দাঁতের দাগ, ছেঁড়া জামা, পটি—
পিছনে পা ফেলে আসছে ফোঁটা ফোঁটা গরম কুমকুম…

রেন্‌ট্রি

ভাইবন্ধুদের নিয়ে দাঁড়িয়েছো বৃষ্টিগাছ রাস্তার দুধারে। একটু পরে
পাতাকুড়ুনির মেয়ে এসে
সাইকেল হেলিয়ে রাখবে তোমার গুঁড়িতে। ব্যাগে ভর্তি করে নেবে পাতা
মন্তেসরি স্কুলের বাচ্চারা
তাদের আণ্টির কাছে দলবেঁধে সেগুলো চাইবে। একদিন গিয়ে আমি
দারুণ লজ্জায় পড়ে গেছি, বৃষ্টিগাছ, টিফিনপ্রহরে –
পড়ে গেছি দারুণ খুশিতে আমি রাস্তা থেকে একদম খানায়
ভাইবন্ধুদের নিয়ে তোমরা তো দেখেছিলে, লরীওয়ালা দুজনও হেসেছে
আমি তো জলের মধ্যে খুশিতে টিনের কৌটো, বৃষ্টিগাছ
বাচ্চারা পাথর ছুঁড়লে টং!
ভেসে ভেসে ঘুরে যাই সাঁকোর তলায়।
অথচ উপর থেকে পা ঝুলিয়ে ওদের আণ্টিকে
মাসী বললে রেগে যেতো। কাকীমা বললেও তাই। একদিন চরম রেগে উঠে
শাড়ির নিচে কী আছে বুঝিয়েছে সবটুকু, আমার পিঠের মাংসে ঢুকে গেছে
নখ
অন্ধকার বৃষ্টিগাছ, তোমার তলায়
জ্বরো রুগীদের শব্দ ধাপে ধাপে প্রাণীদের গোমরানো পাশব···
উঠে দাঁড়াবার পর পোশাকে অজস্র কুটো, ফুলে ওঠা ঠোঁট। তখনো সে
মাটি থেকে চুলে আটকে যাওয়া শুকনো পাতা
খুলে নিয়ে
রেখেছে নিজের ব্যাগে—কিসের স্মারক?
সেদিন যা দেখেছিলে, দয়া করো বৃষ্টিগাছ,
অন্যকে বোলো না
ভাইবন্ধুদের নিয়ে এখনো রাস্তার ধারে দাঁড়াও পরপর
মন্তেসরি স্কুলে যাক নতুন বাচ্চারা
আজ এতদিন পর আমার পিঠের ক্ষত বিষিয়ে উঠেছে
জ্বালা আর টসটসে পুঁজ
জলের মধ্যেই থাকি বেশিক্ষণ, যদি কখনো বা মাথা তুলি

নোংরা ইতর জল দেখা দেয় ; স্রোতের উপরে তেল ; দেখতে পাই

সামনের চড়ায়

আটকে আছে মোটাসোটা শৃগালীর শব

পিঠের উপরে বসে ফেটে বেরিয়ে আসা অন্ত্র ঠোকরাচ্ছে কাক…

বন কি ওদিকে ? তুমি স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছো,
সব কাঁচগুলো নামানো…
সারারাত এই ভারী ট্রাক
চলেছে, এখন ভোর ; বন কি ওদিকে ? কালরাতে পশুরা কি বেরিয়েছিল
খাবারের খোঁজে ?
কাল সারারাত এই ভারী ট্রাক ছুটেছে, খড়খড়ি কাঁপলো তার শব্দে, অন্ধকার
মশারির চালে
লাফিয়ে পড়লো কি কিছু ? রণক্লান্ত বরবউ ধীরে ধীরে উঠে বসলো
পাশবালিশের দুইধারে
'টর্চটা জ্বালাও না গো' নিঃশব্দ সুইচ আর ঝকঝকে হেডলাইট
একটা বাঁক এইমাত্র পেরোলো
সারারাত ভারী ট্রাক ছুটেছে 'ঐ তো কুঁজো, গেলাসটা দেবে ?'
টায়ার সমস্ত রাত, পীচ, পীচ, কালো আর 'পালিয়েছে, বোধ হয় ইঁদুর !'
বন কি ওদিকে হবে ? ওদিকে তো হানাবাড়ি কিনেছেন বনানীমাসীমা ।
স্বামী তিন বছর নেই, এখনো চুলের ঢাল ছাপিয়ে নেমেছে পিঠ
এখনো কি জানোয়ার বেরিয়ে আসে পিছনের বনে ?
চারদিকে দুপুর খাঁ খাঁ । স্বামী তিন বছর নেই, একরাশ রেকর্ড, আরো
একরাশ বই
চারিদিকে দুপুর ; তুমি গান শুনতে চলে গেছো উপরে, উপরে—
দিলীপ রায় ভালবাসি, শচীনদেব, ভালবাসি এইখানটা, এখানটাও
ভালবাসি, একটু আর একটুখানি, আপনার ভালো লাগছে বনানীমাসীমা ?
আজ কতদিন পর ছুটে আসছে ভারী ট্রাক, কতদিন পর
টায়ারের নিচে পীচ সারারাত টায়ারের নিচে,
সামনে কেউ পড়ে যদি পিষে গিয়ে রক্তমাংসতাল
যেমন তিনবছর আগে গড়িয়ে গিয়েছে রক্ত রাস্তার পাশের গর্তে—
সাবধান দম্পতি !
খড়খড়ি ডাকলো কেন ? কী লাফালো মশারিতে ? সাবধান, ধীরে ধীরে
উঠে বসো দুইধারে পাশবালিশের

'টর্চটা কোথায়' আর হেডলাইট এক্ষুনি তো ঘুরে গেল নতুন একটা বাঁক
ওদিকে বনের মধ্যে ডালপালা দিয়ে ঢাকা মড়িটার কাছে

একমনে এগিয়ে চলেছে জানোয়ার

ডালপালা সরানো ! একি ! মড়ি নেই—আধখাওয়া দেহ উঠে

চলে গেছে তবে কি নিজেই ?

কোনদিকে ? সব ঝোপ তছনছ, গায়ে কাঁটা বিঁধে রক্ত, মাটি কাঁপছে

সারারাত্রি আছড়ানো গর্জন

সারারাত্রি টায়ারের নিচে পাঁচ, কেউ পড়লে পিষে যাবে রক্তমাংসতাল…

অবশেষে ভোরের দিকটায়

ডোবার কাছের ঝোপে শুতে গেছে খ্যাপা জানোয়ার

সারাগায়ে কাটাছেঁড়া নিয়ে

বন কি ওদিকে ?

স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়োছো তুমি, সব কাচ নামানো…

বাদুড়

পেয়েছি ডুমুরপুষ্প, ভূতের জিহ্বায় আমি পেয়েছি রামের নাম, রে বিরহ,
তেরোমাস বেরোসনি বাইরে
চকচকে বুটজুতো হাতে পেয়েছি পাপের স্বপ্ন, পৃষ্ঠদেশে চাবুক সপাং
রে বিরহ, তেরোমাস পরে আজ বেরিয়ে এলি দরজা খুলে,
গুহা খুলে,
মাঠাকরুণ কুটুমবাড়িতে
দুহাত ছড়ানো ভূত ছাদ থেকে ভেসে আছে হাতের বদলে পেয়ে ডানা
বিরহ রে, চকচকে বুটজুতোপরা রুপোলী চপ্পলপরা, তোর পায়ে চুমু আর
তোর পায়ে কুড়ুল !
সাতমাস নৌভিতে ছিলো, ঝিমমারা চাঁদের নিচে দুহাত ছড়িয়ে
একমাত্র-বাদুড় সে-ই—হানা দিচ্ছে কাছাকাছি দেবদারু গাছে
সাতমাস নৌভিতে ছিলো, দাঁড়ের শব্দ কি জলে ? তখন স্টিমার হয়নি,
ছপছপ ডাকাতের ছিপ
জল কেটে এগিয়ে আসছে, এসে লাগবে সন্ন্যাসীবাগানে
'মাগো আশীর্বাদ কর্, সিদ্ধেশ্বরী মা আমার, আঙুলের তাজা রক্ত নে মা--
কখনো হারেনি রানা, ওদের লেঠেলরা যদি বাধা দেয় রক্তগঙ্গা,
মাছিটাও অক্ষত থাকবে না—'
ছোট্ রে বিরহ, পালা, আজ তেরোমাস পর বিভিন্ন ভাগাড়ে মুখ
দিয়ে দিয়ে শেষে
এ কোন্ ঝোপের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিস ? ছোট, যদিও পকেটে তোর
ক্ষিপ্র ল্যুগার
এইখানে ফায়দা নেই, ওরা দেখলে নিমেষেই টুকরোটুকরো কুচিকুচি যাঃ—
তার চেয়ে পাইপের মধ্যে, মনে কর্, কীরকম কাটিয়েছিস চারদিন
মেয়েটার রোগা রোগা পায়ের ভেতরে
ঘায়ের গোল গোল দাগ সেই বচপনের ;
শেষে চোখ উল্টে গেলো যখন—গা গুলিয়ে ওঠে, ভ্যাপসা গন্ধ,
ঠোঁট ফাঁক, চোখ আধখোলা,
তারপর ছেড়ে এলি ওকে পাইপের মধ্যে, পচে উঠবে পরশুর আগেই—

পেয়েছি ভুমুরপুষ্প তোর কাছে বিরহনাথ, ভূতের জিহ্বাগ্র থেকে

পেয়েছি রামনাম

তেরোমাস বাইরে বেরোস নি—আজ বেরিয়ে এলি দরজা খুলে,

গুহা খুলে,

হাতের বদলে নিলি ডানা

ফ্যাকাশে চাঁদের নিচে একমাত্র বাদুড় তুই, ঝাঁপ দিলি

ঠিক যে ঘরের ছাদ থেকে

তারই কড়িকাঠ থেকে ফাঁস লাগালো ঠাকরুণের স্বামী নেয় না অসতী কন্যাটি

গায়ে বস্ত্র নেই, তুই মনে কর্, খানিকটা বাদেই সব লোকজন ঘুমোলে

অদূরের দেবদারু গাছের তলায়

সে আসবে আশনাই করতে, তোর সাথে। তেমনই বেরোনো জিভ

বাঁকা ঘাড় একপাশে, ঠোঁটের কোণায় রক্ত কালো,

ঠিক তেমনি ভেসে আছে হাওয়ার ভেতর আর পায়ের আঙুল সব নিচু,

মাটিতে পেঁছতে চেয়ে শেষমুহূর্তে খুলে গিসলো হাড়···

কবর

রেখেছি নরম করে পাথরের খরস্রোতা ফুল।
এর কোনো অর্থ নেই। রেখেছি গোপন করে এই
রাজগৃহস্থের মস্ত আমবাগান ; সেই বনে গিয়ে পেতে দেই
তোমার কবর আমি একা একা। ভোররাত্রে উঠে ভিজে চুল
ছাদে যে ছড়াও, আমি জড়িয়ে নি কবরে পাতায় খরস্রোতা
যত ফুল পাথরের গোছাই নরম করে। বিকেলে উঠোনে
মা দিতে বসলো আঁচ, মুরগি ধরতে ভাই নামলো বনে
কে তার অলস বই খুলেছে দুপুরবেলা আমি কি বলবো তা ?

বলবো কি পথে পথে যত হঠবালিকার হিলতোলা খড়ম
বেজেছে, সাইকেল-যুবা কাটা গেছে তত বেশি ? কোমরে ভোজালি
গেটপথে আসে এক বাহাদুর, ঘণ্টা দিতে সারা ক্লাস খালি ;
হলঘরে একা একা শাস্তি নিতে বসেই তো খরস্রোতে জ্বাললাম নরম
যত শূল পাথরের, পাতার রাশিকে এসে যথাসাধ্য ছাইলাম কবর
লুকিয়ে, না থাক অর্থ ! তাও কি প্রত্যেক দিন ভোররাত্রে উঠে এই ভোর
ঘুম থেকে ডেকে ডেকে তুলে দেবে আমাকেও ? ওরও কি স্বভাব এরকম ?

অভিশাপ

চলো ঘরে, কুশলী বণিক, জলচর। নিয়ে সোনার কলস
যেদিন প্রধান বজরা ছেড়ে যায় সেই দিনই পিঠ থেকে বাঁক
এ পাল্ক নামালো পথে, হাওয়া লেগে যেতে ভারি মায়াপরবশ
একটি ফুল উড়ে এসে পড়ে সেই দেহের সম্মুখে। তবে থাক

সে ওই দাওয়ায় বসে। চলো ঘরে কুশলী বণিক। জলে চর
জেগে উঠে শুয়ে আছে সারাদিন, সারাদিন রোদে রাখা পিঠ—
দুবেলা প্রচুর পাখি আসে, চলো, ফেলা যাবে, ওখানে নোঙর ;
মনে পড়তেও পারে ভেজা সে-কাপড়, যাতে কাদার ছিট ছিট···

সে বেড়ে রেখেছে ঘরে চিড়ে-দই, পাখি আসে দুবেলা প্রচুর ;
নামে ওরা পিছনের খানায়, চঞ্চুর ঘায়ে খুঁড়ে তোলে সাপ,
মাথায় চাপিয়ে পাতা জংলা মেয়ে ফিরে আসে দিশী মদে চুর···

'যদি ঘরে না ফেরো তো শিং তুলে মারুক পাহাড় তলা থেকে
যদি ঘরে না ফেরো তো শিং তুলে মারুক পাহাড় তলা থেকে—'
দুপুরের ফাঁকা চরে শোনা গিয়েছিল এই স্পষ্ট অভিশাপ।

চলেছে জলের নিচে সমস্ত কলস আজ তোমার সঙ্গেই, এঁকেবেঁকে

দাঁত

আশ্রমের তারে এসে পাখি বসে, মাথা আমি ঠুকি না দাহন,
পাখির নখের কাছে ; তারে ছিন্ন হয় শাড়ি ব্রহ্মচারিণীর ;
'যাই, হাতে বীণা পেঁছে দিই'—আর নিকটে পেঁছিয় কাশবন
ঘাটের পিছন থেকে। আমি তার পাশ দিয়ে পালাতে পারি নি,

কুমীর চোয়াল খুলে শুয়েছিল জ্বলজ্বলে খিদের গরজে।
আমাকে জলের নিচে ব্রহ্মচারিণীর দাঁত ধরেছিল পা-য়,
ছাড়াতে পেরেছি কিনা বুঝি না, দাহন মিথ্যে নিশীথে ফেঁাপায়
আমাকে জড়িয়ে ধ'রে। বলে এত শীঘ্র তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, যে

তোমার কলিজা আমি খুলে নিতে পারি না, আতঙ্কে ফিরে আসি
মাংস জ্বলবার গন্ধ তা নাহলে গ্রামবাসীরা পেয়ে যেতে পারে—'
আশ্রমের তারে গিয়ে বসে পাখি, আমি যাই সাঁকোর ওপারে ঃ

গ্রামের মাথায় লাগছে কমলা আগুন, আজ আসবে না দাহন কখনো।
বরং চোয়াল পেতে শুয়ে থাকবে চড়াতেই, আমি উঠে গেলে পরে কোনো
ভালো আত্মা একা এসে বসুক সাঁকোয়, আজ সতেরোই পউষ, ছিয়াশি—

আমি যাই, ব্রহ্মচারিণীর দাঁতে আরেকবার শরীর দি আসি।

কিরীচ

নেমেছে অশ্বের নীল জরা, আমি ফিরে যাই ছাইভস্ম রেখে···
ঘুমোতাম লতার তলায়, এসে মেয়ে-সাপ চেটে দিতে কাল
শরীরে কী ক্লোরোফিল, ভুলবো না কোলাপ্সিবল ছায়াজাল !
ভুলবে না তোমরাও কবে মহিষীকে জড়িয়েছো ; গেটের কাছে কে

উবু হয়ে বসে তার নিজের পিঠের মধ্যে বেঁধানো কিরীচ
তুলে দিতে অনুরোধ করছিল ? শুনিনি, ঘুমোতে গেছি খাদে—
রাস্তা থেকে আহতকে তুলে এনে একরাতের জন্য রেখে ছাদে
মহিষী আঁচল ঢেকে এনেছিল রক্তভরা সুন্দর পিরীচ ।

আমিও ঘুমের থেকে মুখ তুলে পান করি, কোলে রেখে মাথা
সে তার ধারালো জিভে ধীরে ধীরে চেটে দেয়, এ শরীর ছেয়ে
গেল কী সবুজতর ক্লোরোফিলে ! গাছেরা সবাই মিলে ছাতা
খুলে ঢেকে দিল নিচে আমাদের···লতার তলায় সব খেয়ে
সে ঘাসে মিলিয়ে গিয়ে বলে গেছে, 'অশ্ব, এই জরা আজ তোরই !'
গুঁড়ি মেরে নামি খাদে, ক্ষত হয়, নেমে আসে গরল গা বেয়ে—

লতাদের কাছে আমি পিঠের কিরীচখানি খুলে দিতে অনুরোধ করি ।

উদর

স্রোত ফেলে রেখে গেছে আমাকে লুকোনো এই খাড়ির কাদায়
পাথরের চাঁই পেতে আমি আর থাকি না রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে
কাদায় আঠালো মাছ ছিটকে উঠে আসে আর আমাকে তা দেয়
যে-পাখি, আমিও তার উদরের তলা থেকে নিজেকে সরিয়ে

কিছুতে নিই না। সেও তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে চুল থেকে পোকা
একে একে বেছে দেয়। স্রোত ছেড়ে গেছে কবে এই শূন্য খাড়ি—
কাদায় যে সব মাছ ছিটকে ওঠে তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি
এখনো কয়েকটা মাস। আরো ভরে নিতে পারি শরীরে করকা

জ্বলজ্বলে অঙ্গারের। সেই ভরসায় আমি ছুঁড়ি রোগা শর
চাঁদের থালার দিকে। ঝন্ করে ওঠে, যেন হাত থেকে কাঁসা
পড়ে গেল কার সেই গ্রামের বাড়িতে, ছুটে গিয়ে দেখলাম

লজ্জার ঝলক মুখে, আর গৃহকাজ থেকে ফুটে ওঠা ঘাম
মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে থেকে মিশে যায় হাওয়াতে নির্ঝর
বাতাসে ঝাঁপিয়ে পাই কাদাজল, ঘটবে না আর ফিরে আসা—

স্রোত ছেড়ে গেছে যাক। আমাকে উপর থেকে ঢেকে রাখো দানবী উদর।

ছাই

ফাল্গুনের ক্ষত, যাও, অন্ধকারে পায়ে কুশ ফুটে
তারা চিনে চিনে ফিরে এসো। এরপর ক্ষুন্ধ হিম
শুরু হয়ে যাবে এই শুয়ে থাকা পুরনো মরুতে।
সারারাত্রি জেগে তুমি তৈরি করে নেবে না পিদীম ?

কারো পা তীরের বালি মাড়িয়ে দৌড়েছে, আজ এই জলে তার
একগাছি চুলও যদি ভেসে থাকে নেমে যাই তাই ধরে ধরে
তলায় সবুজ দেশ কাকে বলে 'ছোটকাকী ফিরে এসো ঘরে?'
কপালে জ্বলন্ত টিকলি, প্রায় সব খুলে রেখে লুকিয়ে সাঁতার

সেও তো দিয়েছে আর তেমনই লুকিয়ে তুমি ঐ শিরিষের
ফাঁক দিয়ে দেখেছিলে সোনামাছ। চলে গেছে বেড়া গায়ে গায়ে
ফাল্গুনের ক্ষত যাও অন্ধকারে কুশ ফুটে পায়ে
ফিরে এসো ; তারা চিনে চিনে দিন ঠিক করো মাঘের তিরিশে

বন্যা বেশি হলে তুমি সেই কবে জেলে নৌকো ওবাড়ির গেটে
বেঁধে দিয়ে এসেছিলে ? মনে করবার আগে দূর থেকে চিতা
নদীর ওপারে একা জ্বলে ওঠে। শুকনো পিণ্ডের দলা চেটে
পালায় শৃগাল। তুমি চাইছো যে পিদীম আমি তৈরী করেছি তা।

বলো কে তীরের বালি মাড়িয়ে দৌড়েছে কবে চুলে তার মেখে দিলে বালি ?
পা কিছু পাচ্ছে না, শুধু ঘোলা জল ঘোলা জল, পালাবার সমস্ত প্রণালী
বাইরে ফেলে রেখে এসে দেখি আমি, ঘরে নেই কনে !

শয্যায় জ্বলন্ত টিকলি, অন্য কোণে ফুলের মুকুটে
সামান্য সিঁদুর চিহ্ন। তবে এতদূর নামা ভুল ? এই রাতে তীরে উঠে
তারা দেখে দেখে তাকে খুঁজে দেখো। নয়তো হঠাৎ কি কারণে

হিম শুরু হয়ে যাবে বুঝতেও পারবে না। এই মরুর পুরনো
খসখসে বাতাস এসে জানাচ্ছে এখন সেই গ্লাইসাইকেলে

ষোল বাই দুই ডি-তে এঘর ওঘর করে বেড়াতো যে-ছেলে
ভাইকে পা ধরে তুলতো জলভর্তি ড্রাম থেকে, তার কথা শোনো

আজ এই ফাল্গুনরাতে। কী শুনবে? দূরে কলাবাগানের ধারে
লাল ফ্ল্যাগ নীল ফ্ল্যাগ রুবী ঘোষ ভিকটিস্ট্যান্ডে এসো। ওই পারে
শ্মশানে ঘুমোচ্ছে লোক, চিতা নেই। এখন নদীর মধ্যে নামা

উচিত হবে না, তবু উঁচু থেকে দেখা যাবে জলের তলায় মোরগেরা—
তাদের ঠাং বাঁধা, গলা উড়ে গেছে। নিচু ক্লাসে মেয়েটির সাথে
তখন সে পোড়াত বাজি, আর কিছুদূরে উঁচু অন্ধকার জেল
কাঁকিয়ে উঠতো রাত্রে, এই কথা বুঝিয়ে, যে, এরা
নিশ্বাস নেবে না আর। সেই সব দিনেই তো মেয়েটির মুখের ঘামতেল
জ্বলেছে লজ্জায়, তুমি সামনে এলে। পাশাপাশি দেখতে না লাফানো শকুন
দিনের বেলা ছিঁড়ে নিতো ছেলেদের শব থেকে মাংস আর জামা?

সে সব ক্ষতেরা নেই। শুধু দাগ খাঁ খাঁ করছে চারদিকের রাতে।
মাঠে আসলাম তার কারণ, এইবার তৈরী করেছি পিদিম।
এবার দেহের চর্বি ঢেলে দিই ওতে। যতটুকু দাহ্যগুণ
এখনো রয়েছে তাও ওই মৃত জলে মেশবার
আগেই দেশলাই জেলে ধরিয়ে দি রক্ত হাড় চর্বি শেষবার……

পরে যত খুশী ছাই মরুতে উড়ুক, আমি সেটা নিয়ে ভাবছি না হিম।

মূর্ছা

সুড়ঙ্গ

তলিয়ে চলেছি, চলো আমার দুপাশে পালকেরা
ফেলে আসবো না আর কোনো চোখ যা কূপের নিচে এতদিন
তাকিয়ে থেকেছে—এক ডিমের তরলে ভাসমান
পাখির আত্মায় আমি তলিয়ে চলেছি, বিষ্ণু, চারিদিকে রক্ততরলের
শতধারা ফেটে যায় দশলক্ষ নাভি থেকে—সে সব গহন ক্ষতমুখে
ফুঁসে ওঠে দাহ্য সব রঙকণিকারা
আমাকে এ মরবেগ চাপ দাও মুছে ফ্যালো দুধসুড়ঙ্গের তলদেশে

নৌকো

আরো পুঞ্জ, আরো বিস্ময়ের পারে দ্বীপ
লতাজাল, পায়ে ধরো, নৌকো ঘাটে ঠেকলো না এখনো
ধরো দুটি পায়ে, লতাজাল

আরো কুঞ্জ, বাঁকানো রেখার পারে দ্বীপ
মা এলে হাতের ঝুড়ি সবজি ভরা, সবজির ভিতরে সারা গ্রাম
ভোরে ফুটে উঠছে বাস থেকে

ওগো শুনছো, পাখি আমাদের নিলো পিঠে
না রেখে বিতানে, রাখলো খোড়ো ঘরে, এই, দূরে কীসব ডাকছে না ?
চলো, এই দ্বীপ থেকে চলো !

কুঞ্জ নয়, রাত্রির ওপারে সব দ্বীপ
জ্বলে, ভেসে ওঠে—আর কাঁপেও বাতাসে, তাই দেখে
চাঁদে গিয়ে লুকোয় শশক

শশকের দেহে জল নেই
তার গায়ে ঠাণ্ডা বালি, তার গায়ে খাদ, তাও তাকে গর্ভে ধরে
জলে ধাক্কা খেয়ে উঠলো চাঁদ

এত পুঞ্জ ? রাত্রি বয়ে গেলে এত দ্বীপ
জলে ভেসে ওঠে আর এত শেওলা রাতে আসে ঘাটে ?
ভুলে গেছিলাম, লতাজাল !

ওখানে পাতারা, এখানেও ।
গোড়ালি ডুবলো যেই পদ্মের রঙে, বাঁকানো রেখার পারে ছই……
পায়ে ধরো, লতাজাল, নৌকো এসে গেছে !

রাত্রিকথা

ঘন চাঁদ তুলে এনে এই খোলা নেশাতে আমি ঝরঝরে শরতে রাখলাম
যেন মিশিয়ো না একে
স্তূপ করা খড়ের চূড়ায়, একে জন্তুর দাঁতের বাঁকা
খিদের পিছনে কোনোদিন

আশঙ্কা কোরো না যেন, কারণ তার ফলে এই জঙ্গলের
আঁকাবাঁকা শৃঙ্গের উপরে
লতা আচ্ছাদিত নারী এসে
দাঁড়াতে পারবে না আর ; কোথা ডাল নুয়ে ছিল তার থেকে
মহিষের পিঠে এক চিতা

ঝাঁপ খেয়ে পড়েছে, কামড়ে ধরেছে চকচকে কাঁধ, ঘোলা চাঁদ
মাথা তুলে দ্যাখে সে-পাগল
এ জঙ্গল থেকে ও জঙ্গলে
দৌড়য় গাছের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তুমি ডালাখানি ঝিনুকের
বন্ধ করে আনো

তুমি এ বনের সব টক-কটু-মিষ্ট ফলে ভরে দিলে
শ্রুতিময় যতেক মৌমাছি
মেনে নিই আজো সে-ডানারা
আমাকে পাগল করে, তারা মরে গেলে পর তাদের পেটের মধু আঠা

আমাকে মাখিয়ে দিয়ে দ্যাখোই না কত স্নেহে
চারবেলা হাত-পা কামড়াই !
আজ একবার ফলগুলি খোলো না !—
খোলো না যাত্রাটি, যদি জঙ্গলের শৃঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে
লতাপাতা জড়ানো কন্যারা

জ্বালাও না সরল তুষ ! তাহলে চকচকে পিঠ তার কাঁধ

কামড়ানো চিতাকে
ধাক্কায় খসিয়ে ফেলতে পারে হয়তো বা—
তাই বলে তুলো না একে বালিস্তূপে, তুলো না দগ্‌দগে কাঁচা
গোল ক্ষতস্থানে :

আমাকে কমলা জল মুগ্ধ করে দিতে পারো কিন্তু
আমি একরাতও শোবো না
তোমার বালিশে মাথা দিয়ে—
শরীর বেতারকণা, ধুলো বা উল্কার মধ্যে পথ করে উড়বার কী খুশি !

কালোই বেশিটা, তবু এতরকমের রঙ দূরেশূন্যে
জ্বলে তা জানতাম ? আমাকে শরীর থেকে
ছেড়ে দিলো যে-বিরাট ফেটে যাওয়া তারা
তাকে ধন্যবাদ, এই জঙ্গলের রাত্রিকথা শোনানো গেল না বলে
একমুঠো পরিতাপও তাকে……

সাপের খোলশ দুলছে অরণ্যের আঁকাবাঁকা শিঙের মাথায়। দিকে দিকে
এত যে ফলেরা এসেছিল
আজ যা বললাম শেষ, ওদের কমলা মুখ আর কখনো
আকাঙ্ক্ষা করবো না……

চাঁদ

প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ দেখা দিলো বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
রাত্রিকে একবার যদি ধারালো সুন্দর হুলে বিঁধে তুলে নিয়েছিলে
প্রকাণ্ড ভিমরুল
তাহলে এক্ষুনি কেন ডানা থেকে ফেলে দিলে তাকে ? ওই অত
উঁচু থেকে
সে নিচে পড়ছে হুহু বাতাসের মধ্যে আমি সারারাত্রি ঘুমোতে পারি নি
সে নিচে পড়ছে টুকরো বৃষ্টিরা দুদিক থেকে সরে যাচ্ছে মারাঠা দুর্গের
মতো বাড়ির নিঝুম চিলেকোঠা
ফেরায়নি গোমড়া মুখ একবারও তলা থেকে, তবু তার ভাঙা ভাঙা
আলিসায় উঠে
নরক ফিনফিনে সাদা উড়নিটি পেতে দিলো হাওয়া ও আকাশ থেকে জলে
এত সুরাবাষ্প তবে কোথায় পালিয়ে ছিলে এতদিন ? আমি
যখন উদ্ভিদরূপে জলাজঙ্গলের মধ্যে থাকতাম তুমি ছোটো কলসি করে মদ
আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিতে, ঢেলে দিতে সামনের জলার মধ্যে
তার নিচে কচ্ছপরা ঘুমোতো—
তাদের খোলায় যত কাটাকুটি আমি সব পড়তে পারতাম
আমার পাতারা খেতে ভালো কিনা সেকথা নরক লিখে রেখেছিল
অন্য সব গাছেদের কাছে
যেসব গ্রহরা ছিল বায়ুহীন আমি রোজ অক্সিজেন পাঠিয়েছি
তাদের সবাইকে, আজ বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে, হালকা চাদর দিয়ে তার
সারাদেহ ঢাকা তাও হাওয়াতে মেশানো দুই পায়ের ঝটকায়
মাঝে মাঝে মেঘ ছিটকে বেরোতে পারছিল, ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ি
আটকে দিলো তাকে, বলো সুরাবাষ্প, তোমার যা-কিছু
ধাতু, হাওয়া বা আগুন
আগে তুমি সব গিয়ে বলে দিয়ে আসতে না চুল্লীর উত্তাপে ?
আমাকে একদিন মাত্র যেতে দিয়েছিলে ওর কাছে আর
সারা গা ঝলসে গেছে কিভাবে আমার

আমি শুধু জানতাম। শরীর পোড়ার সেই হুহু জ্বালা
একবার মাত্র এসেছিল
আজকে আকাশে জলে নিজেই বিছিয়ে গেল যে-মুগ্ধ নরক
বলো ঠিক, কখনো দ্যাখোনি তুমি এমন শৃঙ্গার !
দ্যাখোনি ভিমরুল, যার ধারালো সুন্দর হুলমুখে
রাত্রি এসে বিঁধে গেছে, এবং আনন্দে কাতরে উঠেছে নিজেই
হোক না একবার—তাও সেই কথা মনে করে আজ আমার সারাদেহে রোম
দ্যাখো দ্যাখো, দাঁড়িয়ে উঠেছে। তুমি উদ্ভিদ কচ্ছপ কিংবা
নরম পতঙ্গরূপে আমাকে সৃষ্টি করে নাও
আর যদি পুরুষ করো তাহলে বনের মধ্যে চলে গিয়ে রাত্রিবেলা
তোমার নরম পেটে মাথা রেখে শোবো
তোমার থাবার স্বপ্ন ছাড়া কিছু দেখবো না, ভেবে যাবো
কখন বসাবে দাঁত আমার কণ্ঠায় !
আমার নলীর রক্ত যদি টেনে নাও, কাঁপবো, যদি রাজি থাকো
তবে মর্তে নেমে দেখবো একবার
নাহলে আবার ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ির শিখরে
আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখা দেবে কাল

কুণ্ড

আত্মার তলায় আছে লাল কুণ্ড, তাতে মুখ ডুবিয়ে দিলাম
যেসব গানের বৃক্ষ জাদুকথা জানে
যেসব রাক্ষুসে মাছি বিষপোকা মুখে করে আগুনের মধ্যে গিয়ে বসে
খানিকটা আগুন খেয়ে উড়ে যায়—তাদের উদ্দেশ্য করে এই
আত্মার চরমে আমি সারামুখ ডুবিয়ে দিলাম আর সবরকম বিকিরণ
বন্ধ হয়ে যাওয়া এক তারা
বিশাল শরীর নিয়ে ভেসে ভেসে সামনে এলো, তার অন্ধকূপ নাম
মুছে দিতে চাই বলে আমি
ওই লাল কুণ্ড থেকে তাকে উপহার দেবো প্রাকৃতিক একটি ফোয়ারা
সেখানে রক্তাভ সব মাছদম্পতিরা থাকবে, আমি এক কাঞ্চনরঙের
দানবকে এনে দেবো যার শ্বাস থেকে ফের শুরু হবে নানা গ্যাস—
নানা পদার্থের সূক্ষ্ম গান
আবার আরম্ভ হবে বিমর্ষ তারায়, আর, তার চোখ থেকে আসবে
আলোকণাদের বিকিরণ
'এই আমি দূরবীণ পেতে বসলাম' বলে কুণ্ড থেকে আমি
ভুল করে মুখ তুলে ফেলি
এবং সে লাল ফোঁটা একটু টলটল করে
তারপর মিলিয়ে যায় আত্মার তলায়

জিহ্বানীল

যে আমার নীল জিহ্বা, কোষের ভিতরে থাকা লেলিহান মধু যে আমার
এখন উঠেছে সে-ই ঘুমিয়ে আবার
তাকে দেখা গেল খাদের কিনারে রাত্রিবেলা
আমার শরীরে যত তন্তু ছিল পেশীদের তাদের সকলকে চিরে চিরে
তাকে দিই মিষ্টি জল, অথচ পতঙ্গভোজী কলসেরা উদ্ভিদেরা এসে
তাদের ফুলের মুখ তলা থেকে পেতে দেয়
পাপড়ি উপচে গিয়ে তার
যে সামান্য পড়ে নিচে বোধ করি তা-ই তেজ, তা থেকেই উন্মাদ মরুৎ
কাঠে কাঠ ঘষে দেয়, আবার অরণ্যে লাগে দাবানল, পশুরা
পালাচ্ছে দিশাহারা
ঝলসানো বাচ্চা মুখে ধরে নিয়ে দৌড়য় বাঘিনী, ছুটে ঝাঁপ দিলো খালে
আমি তার কপালে দেখলাম
সে-জিহ্বার নীল দাগ। কোষের ভিতরকার কালো মধু থেকে
দেহ ধরে উঠে সে আবার
শুয়েছে খাদের ধারে, কনুইতে ভর। এই পাতাল পর্যন্ত যাওয়া খাদে
এখন ছাপিয়ে উঠছে তলা থেকে উঠে আসা ঘনরঙ মদ
খাদের ভিতরে যত ঝকঝকে সাপ যত খুদে খুদে পোকা
তারা মরে ভেসে উঠছে তারা জেগে মিশে যাচ্ছে বাতাসে উন্মাদ ধূলিকণা
আমাকে শেষবার যদি কৃপা করে জিহ্বানীল, কোষের কঠোর মধু
কৃপা করে যদি
তবে তার অঙ্কে মাথা রেখে
খাদের কিনারে গিয়ে শুয়ে পড়ি, শেষ হই তার কোলে রক্ত তুলে তুলে···

ধোঁয়াদীপ

ধোঁয়াদীপ, কী করে যে ডোবালে তোমার
লুকোনো বাতাস ঋতু। তাকে এই পথের অতলে কী করে বা
ঠেলে দিলে ? আমি সেই দু' এক মুহূর্ত শুধু চকিতরঙিন ঝিঁঝিঁপাখা
দেখতে পেয়েছি, যারা তোমার নৌকোর মুখে গ্রীষ্ম হেনে যায়

ঠোঁটে করে বিষফল তুলে নিয়ে পাখিরাও ঢেলেছে তোমার
ঝাপসা শরীর ভরে। তাও তুমি এতবেশি সরল জ্বালানী কেন আজ
রেখে দিলে নিজের কপালে ? ফিরে দ্যাখো আজ যত শিখা আকাশে লাফায়
ততই বাতাস ঋতু ছুটে এসে শিখাতেই লুকোতে চাইছে নীলমুখ

আমি শুধু দূরে জাগি। আমি শুধু বুঝি কেন চকিতরঙিন
ঝিঁঝিঁপাখা হেনে গেছে এতদূর গ্রীষ্মরাত। তোমাকে, ও ধোঁয়াদীপ, আমি
সে-কারণে গৃহ দিই, মৃত্যুকোষ রাখি হাতে, আমি জানি আমাকে ছোঁয়ার
সাহসে একবার তুমি ডুবে মরেছিলে সেই পাতালভরানো দ্রাক্ষাজলে

হোমপাত্র

দেহের সরল কোষ ; তা থেকে উড়েছে পথপারে
ছায়াগণিকারা ?
জ্বলেছে দীপের মধ্যে রক্তসলিতার
ক্ষীণ শিশ্নমুখ ?
এই দশদিক ভরে গর্ভজলরাশি
ধীরে ধীরে দুলে ওঠে—তারও নিচে যে-কন্দর পাবে
তার গায়ে নিমেষ তলিয়ে আছে : শৈবালের গায়ে দণ্ড, পল
ঢেউ দিয়ে ওঠে আর সরু সরু কেশশলাকায় যত কাঁপে
তারা কেউ তত নৈশ নয়।
আরো তল, আরো তল, আরো ঘন তল বেয়ে নিচে
যন্ত্রসমূহের উজ্জ্বলতা—
উড়েছে উজ্জ্বল গনোরিয়া, তার পুঁজ থেকে একফোঁটা ওষধি
সেই গর্ভজলে মেশে।
জ্বলবে না চাঁদদীপ ? জ্বলবে না স্নায়ুসলিতার
পাতলা শিখামুখ ?
দেহকোষ ক্রমশ তরল,
খোলা ঝিনুকের মধ্যে জড়ো হয়, কয়লাগাছের কালো গুঁড়ি
কাঁপে আর নত হয়ে আসে কালো ডাল
দশদিকে দীর্ঘজলরাশি
আরো তল, আরো তল, তার আরো ঘনরঙ তল বেয়ে শেষে
নিচে কী রয়েছে ?
কিছু নয়। শুধু এক হোমপাত্র, শুধু এক দীপ, শুধু এক
শ্যামকপোতের মৃতদেহ…

রঙিন গহ্বর

অসামান্য দাহকাজ ফেলে গেছে রঙিন পাখির
হৃৎপিণ্ড। চূর্ণমুখ বালুর ভিতরে জড়ো করে
তার হাতে তুলে দিই যার ঘরে রাত্রে আমি থাকি।
ভোরে তাকে ভ্রমণে পাঠাই আর গভীর আদরে

শ্বেতজোনাকির লাশ ঘর থেকে বার করে আনি।
দাঁড়িয়ে গাছের নিচে একা একা লাঠি হাতে যম
মিছে অশ্রুপাত করে। আলিসায় তার যত রানী
ঝুঁকে এসে ছুঁড়ে দেয় শূন্য থেকে নানানরকম

হৃৎপিণ্ড নিজেদের, লাল নীল পীত যশধারা
বাতাস জড়িয়ে ওঠে। আমি শুধু শ্বেতজোনাকির
করবীনিষিক্ত লাশ বুকে নিয়ে একা শুয়ে থাকি
ঘোর বৃষ্টিপাতে, তার দেহ থেকে জীবিত পাখারা

রঙের ধারার মধ্যে উঠে যায়। আমি যার ঘর
রাত্রে অধিকার করি ওরা গিয়ে অশ্রুগুলি খুঁজে দেয় তাকে
বালুকারাশির থেকে ; সামনে খুলে ধরে এক রঙিন গহ্বর—
আমি যত ডুবে যাই তত বেশি যত্নে দাহ করে সে আমাকে…

আলেয়া হ্রদ

আমাকে নিয়ো না আর স্রোতোপথে, বাতাস আমার
দেহ বয়ে নিয়ে গেল আলেয়াজ্যোতির সরোবরে
আমাকে নিয়ো না আর তমোগুহে, ওই নীল গুহাতে নামার
সমস্ত মুহূর্তগুলি মনে আছে, মনে আছে জলে ভরা খনির গহ্বরে
পাঠালে আমাকে, আমি রত্নকোষ মুখে ভরে উঠে আসতে পারিনি বলেই
আমার শিরদাঁড়া থেকে নতুন সোনার পাত খুলে নিয়েছিলে ; আমি সেই
কাদার ভিতরে শুয়ে ধীরে ধীরে পচে গেছি—হঠাৎ একদিন
স্রোতোরাত্রি আমাকে ওঠায়
পচাগলা হাত ধরে, বাতাস আমার দেহ বয়ে নিয়ে যায়
আলেয়াজ্যোতির সরোবরে ;
সোনার মকরমাছ সেইখানে বসে আছে, যে আমাকে প্রসব করেছে—
কচ্ছপের খোলা আর পাথরের মধ্যে পথ করে
হামাগুড়ি দিয়ে আমি তীরে উঠে পালিয়ে ছিলাম আর
আজ সে আমাকে দেখে সারা সরোবর
তোলপাড় করে তুলে ছুটে আসবে, সারা গা ঝলসে উঠলে রোদে
তার মুখে দেবো আমি শেষ ঝাঁপ, স্রোতোরাত্রি, তুমি এসে দেখো তারপর
আমার অর্ধেক দেহ তার মুখে থেকে গেছে
অর্ধেক সাঁতার কাটছে এখনো সে-হ্রদের ভিতর।

রসায়ন

বাতাস থেমেছে জড়পথে।

নেমো না, গাছের শুঁড় নিচু হয়ে তুলে নিক

আরো নীল রাতির ভিতরে।

ঝর্ণাকেশরের চামরেরা

গুঁড়ি মেরে দোলায় আগুন।

এত পল তবে আমি বোঝার আগেই

খসে গেল হাত থেকে জলে!

হত্যাকে কি এই স্থির ভেজা-ভেজা সামান্য বালিতে

শোয়ানো সম্ভব ?

শুধু ঝর্ণাকেশরের চামরেরা এসে

দোলায় আগুন আর কামপুঞ্জ জ্বলে ধিকিধিকি···

জড়পথ কেঁপে কেঁপে চূর্ণ হয়ে যায়—

থামে না বাতাস, আর অগ্নিও থামে কি ?

জলের তলায় আর বালির উপরে সেই দীপ্র রসায়ন

ধীরে ধীরে শিখা দেয় রাতির ভিতরে···

নেকড়ে

চূড়ায় ফিরেছ, আজ একবার দেখবে না সেই জন্তু কেন
নদীতে উড্ডীন ?

নদী, শূন্যের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় গ্রহের পাথরে
ধাক্কা খেতে খেতে আর আঘাতে লাফিয়ে উঠছে ধারাময় ঊর্মিল বেতার…

একদিন তার থেকে মৃত্যুকে পাঠালে
নিচে—

সে এসে অরণ্যপথে মাঝে মাঝে পেতে দিলো নীল জলাশয়—
কখনো কি তার ভেজা সিঁড়ির উপরে
তুমি শুয়ে থাকতে না সারারাত ? তোমার ঘুমের পথ শুঁকে শুঁকে আজ
সেই নেকড়ে এসেছে আবার। তুমি চূড়ায় ফিরেছ, যার মাথা
আধোজাগা স্রোতের উপরে…
এখন সে-চূড়া থেকে খসে পড়ে সুদীপ্ত চাদর,
অগ্নিমাতালের তাড়া খেয়ে
তোমার ঘুমের রাস্তা শুঁকে শুঁকে ফিরে আসে শরীর ঝাপটানো
নেকড়ে—

বুঝি তুমি মৃত্যুদের পেতে যাওয়া হ্রদের সিঁড়িতে
শুয়েছো এখনো—এই বিভ্রমের মধ্যে জ্বলে গিয়ে
সে এখন ডুবে যেতে চায়
নীল জলাশয়ে, সে এখন
উঠে গিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে
ফেটে যেতে চায় সেই জলকলহের পদতলে…

বীজ

ফিরো না তামস ফল, সারাদেহে রাত্রি নিয়ে ফিরো না—আমার মোহঋতু
তোমাকে আগুন জেলে উপহার দিয়েছি একদিন। তার পরিবর্তে তুমি
আমার শরীর থেকে শ্বেতকুষ্ঠ মুছে নিলে। জলের উপরে
ধূপ ভেসে যেতো, তুমি পাশাপাশি দেহশীর্ষে পদ্মকে ফুটিয়ে
দীঘিতে ভাসিয়ে রাখলে, আমাকে মৃণাল করে রেখে দিয়ে গেলে
জলের উপরে, নিচে। দূর থেকে কাছে আসা হাঁসেদের জোড়া-পা সাঁতারে
আমার শরীরে এসে লাগে ঢেউ, ভেংগে যায় আবর্ত জলের
তারা দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে পদ্ম থেকে তুলে খায় মিষ্টি জহরত।
শোনো, তুমি শোনো, আমি থাকবো না এভাবে।
তোমার স্খলিত বীজ তুলে নিয়ে যত্ন করে রেখেছি পদ্মের
ভিতরে, জানে না কেউ। শোনো তুমি, নিজের শরীরে নিজভ্রূণ
তৈরি করে নেবো আমি। যখন শিশুটি আসবে,
তাকে আমি দীর্ঘকার জলে
একা ছেড়ে দেবো না, বিশ্বাস করো! তলায় পদ্মের পাতা দিয়ে
ঠেলে দেবো সোজাসুজি নদীর স্রোতের মুখে—ভেসে ভেসে গিয়ে
যাতে সেও ঠেকে যায় তোমার ঘাটের কাছে। তুমি স্নান ভুলে
চমকে উঠে শিশুটিকে তুলে নেবে বুকের কাপড়ে,
তার কান্নাকে থামাতে গিয়ে যেই
মুখে ধরে দেবে স্তন, ঠিক জেনো এই এতদূরে থেকে আমি
তোমার সমস্ত দুধ টেনে নেবো—টেনে নেবো আমার মৃণালে।

শক্তি

শোনো, বেজে ওঠে কালো শক্তির জরায়ু। আমি শুনি কোনো কোনোদিন
রাত্রি ফেটে গেলে
চিতা ফেটে গেলে আমি শুনি তার কাঠ ফেটে চোঁয়ানো রক্তের
নিচে মেলে রাখি চোখ, মণি ফেটে গলে গিয়ে পড়ে
চিতার উপরে ওঁ স্বাহা ! এই ঘৃতরাগ কীভাবে যে ক্ষরিত করেছি
জানি না, কেবল দেখি সাদা নীল হাজার মক্ষিকা
আমার শরীরে এসে বসে
রোমকূপে এত হুল ! অথচ কিছুই তারা টানে না, বরং
ভরে দিতে থাকে এক জ্বলন্ত আরক। তার সীমাহীন তাপে
নভোমুখ ফেটে গিয়েছিল একদিন আমি একঝলক দেখতে পেয়েছি
কালো কলসের মধ্যে ফুটে উঠছে শত শত রাগিণীর কোষ······

জলাধার

লাল এক জলাধার, কমলা এক, বেগুনী একজন······
প্রদীপ নিজের পেট ফাটিয়ে আকাশে এত লহু
তুলে ধরে ফোয়ারায় ! আমি শুধু গ্রীষ্মতারকার সাধারণ
ঋতুরন্ধ্রে শুয়ে থাকি, দেখতে পাই বহুদূরে, বহু

ঋতুর ওপারে, সেও এই বিকেলের রশ্মিধার
আঁকড়ে ধরে মরে যায়। গাঢ় ক্রমবিকাশের দেশে
ফলকের চেয়ে আরো বেশি দূর জ্বলতে পারে যার
ঋজু তরবারী, যার বৃষ্টি ফলা, আজ আমাকে সে

ঘন প্রদীপের পেটে ঠেলে দিয়ে বলে দেয় 'সমস্ত ঋতুই
এতে আছে শুয়ে। যদি দেবীপাথরের ভস্মতাপ
এখানে পৌঁছতে পারে কোনোক্রমে, তবে অনায়াসে তাকে তুই
পদার্থে তরল করে নিতে পারবি।' সে যেতেই প্রদীপের চাপ

আমার এই রেতঃশক্তি আকাশে ফাটিয়ে তোলে লহুফোয়ারার
শতধারে। প্রতি বীজ, প্রতি কণা—যা শরীর ছিল তা কখন
রশ্মির ভিতরে মিশে বয়ে যায়, তাকে ধরে সেই জলাধার—
যা ছিল প্রথমে লাল, পরে কমলা, ঈষৎ বেগুনী যা এখন।

বাষ্পমেঘ

ধীরে ধীরে ডুবন্ত পাথর, আরো ধীরে
তলানো শরীর।
দিগন্তে উপচে ওঠে নীল ফেনারাশি, তার চাপ ভেদ করে
যে উঠে আসছে সে কি বরফ-মোড়ানো ধূমকেতু ?
তার এই কোটি মাইলেরও বেশি পুচ্ছের ভিতরে
সবেগে ছড়িয়ে পড়ছি আমি।
এত যদি গতিবেগ তবে ডুবে গেলাম কোথায় ? তবে কই
ধীরে ধীরে তলানো পাথর ?
নীল পুঁজ, নীল শুক্র, নীল আত্মাবীজ
এই দেহবলয়ের মধ্যে ডুবে গেল :
মিশে যায় ফোঁটা ফোঁটা তাপ……
অথচ শরীর যেন ভরে গেছে তরলে তরলে !
কিন্তু এ তরলকেও কে যেন চকিতে বাষ্প
করে দিলো নিমেষ না যেতে—
আর আমি ছড়িয়ে পড়ছি যোজনহারানো পুচ্ছভরে……
এত কি অদ্ভুত অণু, ধূলিকণা, এত কি আয়ন
আমারও শরীরে ছিল ? আমারও কণায় তবে এত বেশি ত্বরণ সম্ভব ?
কখনো ভাবিনি আমি, বাষ্পমেঘ, কখনো ভাবিনি !
তাহলে, সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যদি কোনোদিন যেতে পারি
তুমি অনুমতি করো, আমাকে একবার যেন শ্বেতপ্রভা রূপে দেখা যায়
দূরতম পৃথিবীর থেকে !

ঘনদেশ

জলে জলে যদি এই বন্দনা ভাসালে, জলে জলে
মরা কাঠ ভাসালে যদি বা তার হাতে পায়ে মাথা কুটে কুটে
ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া, শোনাবে কি লতার নিঃশ্বাস ?
মৃত সব রশ্মির শিয়রে
প্রাণীদের হলকা তুমি জাগাবে কি ? অভিভূত যে-কবরে আমি
মুগ্ধ হয়ে আছি তার মুখ থেকে ঢাকা উড়ে গেছে, তুমি
দেবতার সাংকেতিক জলে
ঠেলে দিলে কাঠ, ভেলা, বাতাসের কাঁটা ; বালুদেশে ফেলে আসা
রুপোলী ফিতেও ঠেলে দিলে আর
শনিগ্রহ মিশে গেল স্মিত এক দ্রবণে কোমল—
যে-দ্রবণ হরষিত, তার প্রতি পরমাণু আমি
শরীরে মেখেছি, তার বীজ
আজ দেখি দিকে দিকে জেবলে দেয় ঘড়ি –
মুহূর্তের নিচে ডুবে গিয়ে
ধরে রাখে শিলার ভিতরে জল ; তা এবার তোড়ে এসে বন্দনা ভাসালো
টেনে নিলো মরা কাঠ, অভিভূত যে-কবর বাতাসের ভিতরে স্তম্ভিত
ভেসে গেল তাও,
আমি ফিনকি দিয়ে তার থেকে উপচে পড়েছি
সমস্ত ঋতুর দিকে—তারা আজ আমার দেহকে
বাতাসে পেষাই করছে ; ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া,
পশুদের হলকা তুমি জেবলে আনো—লতার নিঃশ্বাসে ধরো তুলে
দ্যাখো আমি মিশে যাই দ্রবণে তরল পরমাণু······

মূর্ছা

দুই রাত্রি এসে বসে শ্মশানের ভিতরে থমথমে···
না শিলাগহ্বর, তুমি মৃদু শব্দ শোনোনি বলেই
এ নিশ্চয় বলবে না সে এখনো গভীর পেথমে
ঢেকে আছে সারাদেহ ! চিতার তলায় আমি সেই

ঘোর হাওয়া দেখলাম, থেমে আছে। সে এখন গুহাতে আটকানো
অন্ধমণি তুলে নিয়ে পিষে ফেলবে নিচু শিলাতটে।
দুজন রাত্রির মধ্যে একজন তার নীল ওড়না বিছিয়ে বলে 'আনো,
তুলে আনো ওই সাদা কঙ্কালকে, ওর শুকনো নলীতে আবার

মজ্জা শুরু হয়ে যাক—অন্যজন ঝাঁকি দিয়ে সে-গিরিসংকটে
মেলে দেয় কেশভার। আমি দেখি নীল মূর্ছা তার
সারাদেহ পেথমের বাইরে এনেছে। ভয়ে ভয়ে একবার
মূর্ছার ভিতরে হাত বাড়িয়ে দি আর নীল ঘূর্ণির ঝাপটে

আমার এই পাখাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেসে যায়—না শিলাগহ্বর,
আমি কিছু শুনবো না। তুমি দ্যাখো, ঘূর্ণি নয়, ও দুজন রাত্রিরা আমার
শরীর শ্মশানভূমি স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছে—আমি তীব্র মূর্ছার ভিতর
নিঃশেষে তলিয়ে যাই, বাইরে কঙ্কালমাত্র আঁকড়ে থাকে ওর কেশভার।

তাতারপাখি

জলাপাথরের মধ্যে শোয়ানো তাতারপাখি মেরে ফেলে মেরে ফেলে ঘোর
রক্তে মিশে যায় দুধ। জড়মৃত্তিকার মুখ খুলে গিয়ে সামান্য পৃথিবী
মেলে ধরে সাদা আত্মা, লোল আত্মা মেলে ধরে : 'শোন্ শোন্, এই দ্রাক্ষা
তোর।
এ তোর মৃত্যুর মধ্যে গড়িয়ে চলেছে।' তবে চারিদিকে কেন হীনজীবী

ক্ষীণ পতঙ্গেরা উঠে জানায় যে ঘুমোয় নি ? তাতারপাখিটি রক্তশর
মুখে ধরে আছে শুধু ? এই ছম্‌ছম্ আর লালাভরা এই গুল্মতলে
খেলা করে যায় ওর সব মৃত শক্তিগুলি। তারও নিচে পাথুরে চত্বর ;
জলপলাশের সব কোরকেরা ফিরে এসে মৃদু এক শৃঙ্খলের ছলে

আগুন পরিয়ে দেয়। মা গো আমি মরে যাবো। এই ভয়াবহ গতিস্রাব
এভাবে আক্রান্ত করবে ? এইভাবে কি ধীরে ধীরে চিরে দেবে শরীরের ছাল ?
শোয়ানো তাতারপাখি, তুমিও কি বলবে না তোমার তরল মনোভাব
কোন্ দুঃখে বয়ে গেছে ? তোমাকে না জানিয়েই এই জলপলাশে মশাল

জেবলে দিই তবে—আর, আত্মাকে ওঠাও শনি ! মুখ তোলো রক্তাভ মঙ্গল—
মরো, এই গুল্মতলে ডুবে মরো। এ কথায় শরীরবিহীন রমণীরা
তাদের প্রত্যঙ্গগুলি ফিরে পায় ; পৃথিবীও তুলে ধরে সাদা প্রাণ, গোল,
বিপদের দেবতার রক্তে মিশে মিশে যায় মৃত আর জীবিত শক্তিরা !

দূত

নীল জলাভূমি ঘিরে ফিরে আসে বাতাস আবার
তার ফোঁপানোর নিচে
পাথর মধুর রঙ ঝিকিমিকি জ্বালে আর দিশাহীন শ্বেত পদ্মকণা
দূরত্বে গভীর রক্ত রেখাস্বপ্নে তুলে ধরে—তবে কেন দূত নিজে তার
কেয়াপল্লবের ভার ফেলে দিলো হাত থেকে ?
ঝরোঝরো রেখাস্বপ্ন বেয়ে
নীল জলাভূমি ঘিরে ফিরে আসে বাতাস আবার, এক কালো জ্ঞান তার
নিজদেহে
লাগিয়ে নেয় না পাখা, সটান আকাশ থেকে পড়ে যেতে থাকে
নিচে উদ্ভিদের ঢেউ দিশাহারা
নিচে রঙ—পাথরে মধুর শিখা ঝিকিমিকি ওঠে ; তবে, দূত, তুমি নিজে
এই স্তূপ তোলো বুঝি রূপোলী পাতার ?
তোমার হৃৎপিণ্ড থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসা সোনাজল
উদ্ভিদ ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে যায়, ফিরে আসে বাতাস আবার
ঘন শীৎকারে আকুল—
তুমি দূত, তুমি তার শরীরের কাঁপা কাঁপা ফোঁপানো ছাপিয়ে
এই রাত্রে জাগিয়েছ শ্বেত ও মধুর কণা, তবে যদি
জলের তলায় যাকে শোয়ানো হয়েছে সেই চুম্বকের ফিতে
ছিন্ন করো, ছেঁড়া অংশ ধরো যদি সমুখে আমার, আমি সেই
শোণিতফোঁপানো মুখ পারবো তো ঠিক জেনলে নিতে ?

উৎসতাপ

উৎসতাপ, আমার মাংসকে
শতখণ্ড করে তুমি
ছুঁড়ে দিলে তার মুখে এতদিন যে-বুড়ো হাঙর
ঈথার সমুদ্রে ঘুরছে, ঈথার স্রোতের নিচে নিচে
যে আমাকে খুঁজে গেছে
ফাঁকা এক কার্তুজের খোলে চেপে আমি
এতদিন তার গ্রাস এড়িয়ে চলেছি আজ ডুবো সে-তরণী চুরমার
ভারী চোয়ালের মধ্যে চাপ দিয়ে আমার
আত্মাকে গলিয়ে নিলে তুমি, তার কষ বেয়ে গড়ানো সেই তেল
ধরলে যেই করপুটে, উঁচু থেকে ঢেলে দিলে যেই
পৃথিবীর বনে বনে সব ফুল, সাদা কালো সকল দ্রাক্ষায়
আমি
ফুলে উঠলাম মধু, প্রাণী থেকে প্রাণীর ভিতরে
বয়ে চললাম শুক্ররস……

হ্লাদিনী

গৃধিনী

চূড়াকে বোলো না একা, শীর্ষে তার বসেছে গৃধিনী ।
রাত্রি ভরে গেছে জলে, ডুবোপাথরের গায়ে ঘষা লেগে লেগে
তুমি আজ ভেসে উঠলে ধাক্কায় চুরমার মুখ নিয়ে
মুখ থেকে নেমে যাওয়া লতানো রক্তের ধারাগুলি
মাছেরাঅনুসরণ করে আর আসছে না পিছনে ।
এইবার প্রাণপণ সাঁতরে উঠে চরের মাটিতে
শুয়ে পড়ো ; রাত্রি বেয়ে বেয়ে ওই চূড়ার মাথায়
উঠে গেছে চাঁদ, তার গায়ে এসে এইমাত্র বসলো গৃধিনী
তোমার দেহের থেকে মাংসকণা ছিঁড়ে নিয়ে সেও
খাবে ওই দূরে বসে । দেখবে, সমস্ত রাত, এই অনিঃশেষ
জলে ভরে উঠছে রাত্রি, আর তার একফালি চরের উপরে
আঁকাবাঁকা অঙ্গগুলি শুয়ে শুয়ে ভিজছে বৃষ্টিতে……

মৃত্যু বিষয়ক দুটি কবিতা

দ্বীপ সোনাচূড়া

ঘুমের তলায় এক দূরদেশে ভরে তুলি দ্বীপ সোনাচূড়া
জলের ভিতরে যত নীল-হলুদাভা এসে শরীরের থেকে আরো দূরে
ফেলে রেখে চলে যায় শীতে যে-নিহত তার দেহ।
তমোধারা নেমে তার মুখ ঢেকে দেয় আর বায়ুসকলের
যত পাখা আছে, তারা, বেগপ্রবাহের যত শক্তিচাপ রয়েছে, তারাও
আমার শরীর থেকে আরো কোনো দূরের শরীর খুলে নিয়ে
ঘুমের তলায় এক নরম মাটির পিণ্ডে শুইয়ে রেখে যায়
আমি সেই দূরদেশে সারাদিন সারারাত্রি ভরে তুলি দ্বীপ সোনাচূড়া

প্রেমিকা মাটির

ভেসে চলে যেতে যেতে ঠেকে গেল পাথুরে চড়ায়
দেখল যে ততদিনে গলে গেছে প্রেমিকা মাটির
শুধু তার খড়দেহ কাঁধে তুলে, শুধু তার মাটি-খসা মুখ
ধরে নিয়ে শেষবার স্থবির দুহাতে সে আবার
গভীর স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিল, জল থেকে ওঠালো আগুন
যাতে সেই সতীদেহ দুই পলকের মাঝখানে
যতটুকু স্থান আছে তার মধ্যে সাজানো চিতার
উপরে স্থাপিত হয়; এবং সে-চিতা যেন তাকে
বাষ্পে উঁচু করে তোলে—গোল শূন্যে জলকণাদের
ভাসমান পথে পথে যেন ওই দেহ শুষে যায়······

কাঞ্চনকুন্তলা

ঘুমোচ্ছে বুঝি নি, আমি জানলা খুলে দিতে গেছি ভোরে
ভোরেরও তখন রাত্রি, হাওয়াতে সে পাশ ফিরে শোয়
নদীর সামনের মাঠে। উপরে চক্কর মারছে চাঁদ—
চাঁদ জ্বলজ্বলে চোখে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়ায়
তাকায় দুদিকে, আর খুব সাবধানে শুঁকে দ্যাখে।
জিভ দিয়ে চাটে ঠোঁট, দূর থেকে স্পষ্ট হয় রোঁয়া,
তারপরই ছোঁয় বুঝি একবার, কেননা তক্ষুনি
চমকে পিছনে হটে, লাফ দিয়ে, গোঙাতে গোঙাতে
উঠে যেতে থাকে ফের পশ্চিমের গির্জার মাথায়
আমি ফিরে এসে দেখি খাট ভরে যে-চুল ছড়ানো
তা থেকে অজস্র সোনা ঝরে আছে ঘরের মেঝেতে !

বেদেনী

সোনার বিবাহমালা ফেলে রেখে গিয়েছে বেদেনী······
চাঁদ অস্তে নেমে যায়, ডালে ডালে কয়েকটি বাদুড়
রাত্রি জাগে অধোমুখে। সেই গ্রাম কতই বা দূর ?
ওর শরীরের মধ্যে তখনো এ শরীর বেঁধেনি—

চিমনির উপরে ডাল ঝড়ে কাঁপে। তখনো সে কৌমার্যে আতুর।
যে-মুখ বিমর্ষ, আর, যে-মুখটি রক্তাভ চাঁদের
মধ্য থেকে ঝরে এলো আমার হাতের অবসাদে
তাকে আমি কৃতাঞ্জলি ভরে নিই। দেখি সেই তরল ধাতুর

ভিতরে বিবাহসাজ ঝিলিক তুলেছে ! আমি ওই স্বর্ণমালা
তুলে আনতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি যেই নিজ অঞ্জলির সরোবরে
অমনি সে মুছে যায় দশদিকে। আমি শুধু শুকনো ডালপালা
শরীরে বিঁধিয়ে দেখি বেদেনীর ছেঁড়া শাড়ি পড়ে আছে মাঠের উপরে।

ঝিল

ঝিল খুলে গেল ওকে কাদায় ঘুমোতে দেবে বলে....
ঝিল বন্ধ হয়ে গেল। উপরে টলটলে পঙ্কজল।
নিচে পা জড়িয়ে নেয় গুল্মলতাদের বাহুপাশ —
হুহু করে কাদাজল ঢুকে যেতে এতদিন পরে ফুসফুস
টেনে নেয় জলচাপ, এতদিন পরে সে দাপিয়ে
ফেটে যেতে পারে, আর, মুখ দিয়ে রক্তকাদাজল
বেরিয়ে ঝিলের নিচে হালকা মেঘ বুনে দেয় রাঙা···
ঝিল খুলে গেছে আর ঝিল বন্ধ হয়ে গেছে ফের
পা জড়িয়ে নিয়েছিল প্রথমে যে-কুমারী লতারা
এখন সকলে তারা কাদার ভিতরে ডুবে থাকা
শরীরে লুটোয় আর নিজেদের শিকড়ের মুখ
শিরায় ডুবিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে যত বেশি কাঁদে
ওদের শরীর থেকে শোণিতরাঙানো রাগরস
ফোঁটা ফোঁটা করে তত উঠে যায় উপরে বিছানো পঙ্কজলে

হাড়

আমার বিছানা কেউ পেতে রেখে গিয়েছে বালিতে।
বাতাসে গরম ছাই উড়ে এসে আমার পাখায়
লেগে যায় প্রতিরাত্রে। আমি ডানা ঝেড়ে ফেলে দিতে
পারি না তাদের। দেখি দূরে সব গাছেদের বাঁকানো শাখায়

লালা ঝরে একফালি চাঁদের। বলো, আজ তবে আবার পঞ্চমী?
তবে এ বাতাসে কেন তপ্ত ছাই ভেসে আছে? কোথাও তাহলে
আগুন উঠেছে আজ? কে জানে কাদের ঘর, কোন্ ঘাসজমি
কণিকার মতো এসে গায়ে পড়ে! আমার কি এ-ভস্মফসলে

কোনো অধিকার আছে? কোনো দাবি? যে এখন বালির শয্যায়
ঘুমোতে পারে না, আর, পারে না উঠতেও—তার হাড় থেকে কখনো অংগার
বানানো যাবে কি? ওরা শোনেনা কিছুই শুধু উড়ে উড়ে আসে, বিঁধে যায়
পাখার ভিতরে। আর, বালিবিছানায় একা ধিকিধিকি পুড়তে থাকে হাড়!

নিষেধ

শিলাপৃথিবীর মধ্যে এখনো রয়েছ মুখ গুঁজে
পিছনে সমুদ্র ডাকছে। খোঁচা খোঁচা ঝকঝকে পাথরে
রাত্রি এসে গিঁথে যায়। এবং শিখর থেকে নিচে
ঝরে ঝরে পড়ে আর তোমার মাথার ঘন চুল
ধীরে ধীরে ভিজে যায়। দেহ থেকে স্খলিত বল্কল
এখনো লুটিয়ে আছে পাথরে, অথচ এ নিষেধ
না শুনে একটি নারী শিখরের থেকে ঝাঁপ দিয়ে
তোমার শরীরপ্রান্তে নেমে আসে। নিথর শিয়রে দুটি হাত
ঢেলে দেয় আর চুল কেন ভিজে গেছে এই ভেবে
সে হাত উঠিয়ে এনে দ্যাখে তার দুহাতের পাতা
তোমার মাথার থেকে ফেটে পড়া জ্যোৎস্না মেখে লাল!

গোখরো

পাহাড়ের নিচে যত বেশি পাতা জড়ো হয়, রাঙা আঁচে
আমি সেসবের মুখ তুলে ধরি। যদি আঁচ কোনোদিন
আমারও শরীরে উঠে আসে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
তুলে রাখি চোখ। ওদিকে তখন জঙ্গলগুহ থেকে
একটি গোখরো বার হয়ে আসে, তার সারা গায়ে কাদা
নদীতীর থেকে লেগে যায়, তবু সে আমাকে খুঁজে খুঁজে
আঁচের অনেক কাছে চলে যেতে শরীরের সব দাগ
চাকা চাকা হয়ে ফুটে ওঠে ; আমি শিউরে উঠেই চোখ
সরিয়ে নি ঠিক যেখানে গাছের বাঁকা হয়ে থাকা ডাল
তাকিয়েছে ওর ফণার মতন। ভেবে দেখি ওই ডালে
গেঁথে দেবো কিনা আমার এই ভিজে, নিঃঝুম কঙ্কাল !

বাগান

রাত্রি গিয়ে লুকোবে না বাগানের ওপাশে আবার ?
আমি তা শুনি না, আমি বধিরের মতো তাকে মাটি খুঁড়ে তুলে
মুখে দিই স্নেহদাগ। আর দুই চোখের ঝিনুকে
বিষপর্ক খুঁজে পেয়ে বুঝি তাতে সবটুকু ধরে না—
দু'গাল ছাপিয়ে নামে। যেই পৌঁছে যায় ভরা বুকে
অমনি দুই বৃন্ত থেকে ছিটকে উঠে গরম পীযূষ
আমাকে ভিজিয়ে দেয়। তার গতিপথে এত তীব্রতা যে আমি
একফোঁটাও পান করতে পারি না, বরং আছড়ে পড়ি
তলাকার মাঠে আর বাগান ভাসিয়ে দিয়ে শূন্যের মাথায়
ফুলে ওঠে সাদা সাদা কুয়াশার মতো ঘন মেঘ……
ভোরে চোখ খুলে দেখি শুয়ে আছি একরাশ রক্তের কাদায় !

থাবা

উঠোনের পাশে জল জমে আছে। তার পাশে ক্রমশ থাবার
গভীর, আসক্ত, গোল গর্তগুলি ফুটে ওঠে। ওপাশে জঙ্গল—
পাতার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে চাঁদ, একদিন তার ভরা কোল
খালি করে চলে গেছে যে-দুটি জ্যোৎস্নার শিশু—বাতাসে আবার

বুনো শেয়ালের ডাক ভেসে এলে তাদের পুঁটুলি করা হাড়
ঝোপজংলার পাশে পড়ে আছে দেখা গেল, জল এসে ধাক্কা দেয় তাতে—
সরে গেল মেঘেরাও। 'আমাকে ছেড়ে দে তোরা, ছাড়—'
কে বলে উঠলো ? কেউ ছুটে গেল মেঘ দিয়ে ? ঘাটের পৈঠাতে

একফোঁটা রক্ত শুধু ঝরে পড়লো, মাটি ফেটে গেল সে-আঘাতে ?
শিশুদের মরামুখ ভেসে উঠলো কি একবার ?
তা কেউ দেখেনি, বড় মেঘ করে এসেছিল। নইলে দেখা যেত এই ফাঁকা খেয়াঘাটে
চাঁদ চেপে ধরে আছে রক্তে ভেসে যাওয়া নাড়ী তার।

শেষরাতে খামারের পাশে

ওকে রেখে যাবো বলে শেষরাতে আসি এই খামারের পাশে।
পদ্মের ভিতর থেকে জেগে ওঠে সাপ, তার ফণা
দীঘির এপার থেকে দেখা যায়। আমি যে-বাতাসে
ভর করে এতদূর এসে গেছি চুপিচুপি সে আমাকে বলে

'তুমি আর কোনোদিন ভুল করে ও মুখ দেখো না।
দেখো না কখনো আর রক্তনীল যে-কোনো ভ্রমর—
যার দেহ রাত্রিমাখা। কারণ রাত্রির তলে তলে
একা একা ফেরে সাপ, তার ব্যগ্র ফণা, তার বাঁকানো কোমর

কোনোদিন বুঝেছ কি ?' শুনে কেঁপে উঠে দেখি ফণার বদলে
পদ্ম-ই সেখানে জ্বলছে ! কিছু পরে খামার জাগাতে আসবে ভোর-
আমি নিচু হয়ে বসে দীঘি বা রাত্রির কালো জলে
ধীরে ধীরে ঠেলে দিই উপুড় শরীরখানি ওর !

ঘাস

আমি ফিরবো না, এই চারজন শববাহকের
ঘামে ভিজে যাওয়া হাতে তুমি যেন ফেলো না নিঃশ্বাস।
আমি এই ভেজা মাঠে বাতাসে মেতেছি, যত ঘাস
মাথা উঁচু করে ওঠে ততই চুম্বনে দু'চোখের

ভিতরে সবুজ দ্যুতি উপচায় আমার। যে-কপালে
মেয়েটির নিচু হাত কখনো নামেনি আঁকাবাঁকা—
তার হিম রেখা থেকে তুলে নিয়ে ত্বকের প্রলেপ, ওরা জ্বালে
শরীরী ঘাসের শিখা মাঠে মাঠে—এই দীর্ঘ, ফাঁকা

রাত্রির ভিতরে শুধু আতঙ্কে কঁকিয়ে ওঠে কয়েকটি শৃগাল…
আমি ফিরবো না আর, যারা যারা কাঁধে করে এনেছে এ শব
তাদের একজনও যেন না-খেয়ে ফেরে না!—তুমি লক্ষ রেখো সব।
এ মাঠে পড়ুক বৃষ্টি, ধীরে ধীরে ভিজে যাক ঘাসে ঢাকা নিথর কপাল!

স্রোত

তবে স্রোত ধাক্কা দেয় ? তবে তুমি এতটুকু শব্দ না করেই
তাকে রাখো গাছটির তলায় হেলিয়ে ? তবে নীল
গরুড় আকাশপথে বাসা মুখে ওড়ে চক্রাকার ?
না হয় জঙ্গলযাত্রী মরে গেলে সোনার কোমল মালাপথে !
না হয় ঝাঁপ দিলে সেই বাতাসে, মৃতার চোখ গ্রাস করে নিলো !
কোনো ক্ষতি আছে ? তুমি ফেরোনি কি একদিন প্রায় বীজাণুর গতি নিয়ে ?
সংক্রামিত হওনি কি ? আজ তবে অপরাহ্ণে মেনে নাও বাদাবন,
লেবুকুসুমের মুখ মানো দেখি একবার ! আগুনের মেঘে মেঘে
মেনে নাও লাল বাড়ি, চোখ ভরে স্বীকার করো এতসব সাদা-কালো
খেয়ানৌকাদের···
যদি ধাক্কা না-ই আসে তবে এই গুহাদরজার মুখ থেকে
পাথর সরালে কেন ? পাথুরে মেঝের থেকে এত রাত্রে কেন এই গাছের
তলায়
নিয়ে এলে সাদা হিম ওষুধ মাখানো নারীদেহ ?
চুল নখ অবিকৃত—ফ্যাকাশে গায়ের চামড়া, কোঁকড়ানো মৃত যৌনকেশ—
সব কিছু অদ্ভুত ঠিক। গায়ে গায়ে লেগে থাকা অজস্র পাতার ফাঁক দিয়ে
চাঁদরশ্মি নেমে এসে গোল হয়ে পড়েছে ওষুধ-গুঁড়ো মাখা
নারীশরীরের মধ্যে—ফুটে উঠছে চাপা, নিচু স্তনের আভাস···
স্রোত ফিরে আসে, স্রোত ধাক্কা দেয়, তাই তুমি আজ
সারারাত্রি শুয়ে আছো ওই শরীরের পাশে—
গাছের ওপাশে জীর্ণ কাঠের বাক্সের ডালা খোলা···

ভস্ম

আমি যে ঘুমোই, জানি, তুমি ঠিক এসে দাঁড়াবেই
শিয়রের কাছে। আরো জানি, তুমি ওই দুটি জানালা প্রথম
খুলে দেবে ধীরে ধীরে। তারপর হাওয়া লেগে কেঁপে ওঠা মোম
সাবধানে আড়াল করে দাঁড়াবেই। এবং দরজার বাইরে উঠে গিয়ে যেই

শূন্যে জেবলে দেবে চাঁদ, গাছে গাছে পাঠাবে জোনাকি—
আমার শরীর থেকে বার হয়ে এসে আমি রাত্রির উঠোনে
দাঁড়াবো একলাই। আর, দেখবো হরিণরা সব দলে দলে ওদিকের বনে
তরল আভার মধ্যে ছুটে যায়, ওদের বাঁকানো শিঙে অজস্র সোনা কি

জবলবে না তখন? জবলবে! খুরের ঘর্ষণ লেগে কয়েক মুহূর্তে সারা বন
ভরে যাবে হীরের কুচিতে। আমি দৌড়ে গিয়ে হাত ভরে নি' আসবো
কুড়িয়ে
ভোরে ঘুম ভেঙে যাবে। উঠে দেখবো কেউ এসে ওই সব হীরক পুড়িয়ে
ভস্ম রেখে গেছে ঘরে। আমি সেই ভস্ম দিয়ে দেহ ভরে নেবো কি তখন?

জখম

সে এসে পিপাসামুখ চেপে ধরে আমার জখমে।
আমি তৃণশয্যা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দেখি গাছের তলায়
গোল গোল পাতা সব পড়ে আছে। আজ আর তার উপর কোনো
জন্তুরা চলেনি ; শুধু সাবধানে পা ফেলে ওই মরা চন্দ্রালোক
লুকোলো গাছের পাশে। অমনি সব গাছে গাছে এক জপমালা
ঘুরে ঘুরে বলে 'আমি নমিত না আমি নমিত না—'
হঠাৎ সে কোথা থেকে চাবুকের মতো আছড়ে এসে
ফের চেপে ধরে মুখ, জখমের মধ্য থেকে আমার সমস্ত সংজ্ঞাধারা
ফেটে পড়তে চায়—আমি রুদ্ধচাপে কেঁপে কেঁপে উঠে
তার কণ্ঠা ছিন্ন করে দিতে থাকি যতক্ষণ না তার
শরীর পায়ের নিচে বসে পড়ে, যতক্ষণ না লুপ্ত হয়ে যায়
লতায়, বাতাসে……

আমি অবসাদে ভর করে করে
মাটিতে এলিয়ে পড়ি, আবার জখম থেকে কষ
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে পাতায়—তা দেখে চন্দ্রালোক
মৃত আভা সঙ্গে নিয়ে গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে যেই
আমি শিউরে উঠে ভাবি সে এসে প্রখর মুখ ফের চেপে ধরেছে জখমে !

রক্ত

হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজে দিয়ে বসে আছে পাহাড় যেখানে
তার পাশ দিয়ে দিয়ে ফাট-ধরা ভারী দেহ নিয়ে মগডালে
সরে গেল চাঁদ। দূরে, নিচুতে, তখনো উড়ছে ধ্বসে-যাওয়া চালে
সে-মেয়ের ডুরে শাড়ি, যে ভেসে এসেছে গতবছরের বানে :

সিঁড়িতে এলিয়ে আছে, মুখে জড়িয়েছে কেশদাম—
খোলা হাত পৌঁছে গেছে জলের কিনারে, তাতে বিঁধে আছে চুড়ি ;
ঘর থেকে দ্রুত আলো এনে দেখি সে নেই—আমার দীর্ঘ ছুরি
ঘাটের পৈঠার পাশে পড়ে আছে রক্তে মাখা। আগে যদি বুঝতে পারতাম

তাহলে লণ্ঠন আনতে যেতাম না কিছুতেই। আজ মিথ্যে হাঁটুর ভিতরে
মুখ গুঁজে রাখি আর সারারাত ধরে বসে বসে
যখনই তাকাই, দেখি, সে-মেয়ে ঘাটের নিচে একহাতে শাড়ির গোছা ধরে
ছুরিতে মাখানো রক্ত পা দিয়ে তুলছে ঘষে ঘষে !

ক্ষুধা

রাত্রি হলে বুনে দিই আমি ওর শরীরে নিমেষ।
ও কখনো কাঁপে আর কখনো বা অনুনয়-দীপ
হাতে নিয়ে ছুটে যায় অন্য ঘরে—'শেষ তবে, আজকেই শেষ!
এই শবদেহ আর কেউ বুকে তুলবে না, কেউ আর টিপ

দেবে না কপালে ঘষে, এত যদি বোঝো তুমি তাহলে অন্যান্য গিরিখাতে
কেনই বা ফেরাও না অশ্ব?' ফেরাই তো! ফেরালেই ছায়া এসে চোখের
পলক
আমার শরীরে ফেলে চলে যায়। আমি খুব নিকটে থাকাতে
দেখতে পাই ওর সারাদেহ ভরে নীল ও সবুজ পরলোক

শত দরজা খুলে ধরে। তারই ভিতরগৃহে আমার সাপিনী
অন্য পুরুষের সঙ্গে শঙ্খে মেতে আছে, আর তার পরণের
গরদ লুটোয় দূরে। সেই বস্ত্র বুকে তুলে অসহমরণে
সে যখন মরতে এলো আবার, তখন হাত একবারও কাঁপেনি

তাকে তুলে নিতে, তাকে মেলে দিতে লেলিহান চিতায় চিতায়···
তাও সে দ্বিতীয় নারী কী করে বা চর্বিদীপ তুলে ধরে অনুনয়ে লোল?
কী করে পায়ের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ সে-দীপ নামায়?
কী করে বা বলে 'খোল, তোর এই ছাব্বিশ-জরা খোল—
আমি তোর দিদি, আমি, তোর দিদি—খেতে দে আমায়!'

দূরত্ব

রয়েছি দূরত্বে বসে। ঘুরে ঘুরে নেমে আসে একটি পালক।
দূরে দূরে কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া পাহাড়ের মাথায় মাথায়
ছেয়ে আসে ঘন মেঘ। তার মাঝখান দিয়ে গলা তুলে চাঁদ
ফেলে দিলো উঁচু থেকে একদলা রক্তমাখা কফ।

আমি তা দুহাত পেতে ধরে নিই। পালকের গায়ে তা মাখিয়ে
দিতেই সে-রোঁয়াগুলি জ্বলে ওঠে। আমার সমস্ত মুখ, দেহ
হু হু করে ধরে গিয়ে মাংস ঝলসানো দগদগে
লাল চামড়া বার হয়ে আসে। আমি, যেখানে সমস্ত ফলগুলি
পুড়িয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে রাখা আছে স্তূপাকার—
সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝলসানো ঘায়ের মধ্যে ছাই
ঘষে ঘষে দিই আর পালকটি আকাশের গায়ে
বিচিত্র ফুলকি তুলে ক্রমশ মিলিয়ে যায়—

তখন কি আমি

ভস্ম থেকে উঠে এসে পুনরায় দূরত্বে বসি না ?
তখনো কি ভাবি না যে মেঘ থেকে ঘুরে ঘুরে ঘুরে একদিন
পালকটি ঠিক নেমে আসবেই এখানে আবার ?

হাঙর

সে তার রূপোলী আত্মা হাতে দিলো আমায়, তখনই তার রঙ
খরতরলের স্রোতে ভেসে যায় 'ওরে তোরা আমাকে তুলে নে, আমি মিনু'
আমিও শিকারীনৌকা নিয়ে ছুটে তার কাছাকাছি পেঁছে যাই
হারপুন নিক্ষেপ করি জল থেকে মাঝে মাঝে শূন্যে তোলা
খোলা দুটি হাতে
অমনি জলের থেকে চমকে উঠে আমার নৌকার পাটাতনে
আছড়ে পড়ে সারাদেহ খুবলানো হাঙর। তার ক্ষতের উপরে কাদামাটি
চেপে চেপে দিই, যাতে রক্ত থামে। তাও সে-প্রণয়স্রোত থামে না,
আমার নৌকা তার
স্রোতোভারে ঘুরে যায়, সম্পূর্ণ কম্পাসহারা ঠিকরে পড়ে
পাহাড়ের গায়ে
আর সে-হাঙর এক মুহূর্তে অক্ষতদেহ ফিরে পেয়ে তার নিজ স্রোতে
রূপোলী ঝলক তুলে নেমে যায়, আমি একা নৌকার তলায়
তার ফিরে যাওয়া দেখি অন্যান্য মাছের দাঁতে টুকরো হতে হতে...

কর্কট

আমি মাঝখানে আর দুপাশে দুই মা শুয়ে আছে।
পাথরদেওয়ালে এসে ধাক্কা খেয়ে ফেরে বৃষ্টিছাট—
এই অজগর বন ঘিরে আছে আমাদের, পাছে
আমরা শিকারীর মুখে পড়ে যাই। আমি এই দেহ থেকে কাঠ

খুলে নিয়ে মাঝে মাঝে গুঁজে দিয়ে আসি ওই দরজার আগুনে—
যাতে সে না আসে। তবু পাথরদেওয়াল বেয়ে হঠাৎ কীভাবে খড়্‌খড়্‌
আওয়াজ উঠেছে? কেউ এগোচ্ছে শরীর ঘষে ঘষে? আমি সেই
শব্দ শুনে
লাফ দিয়ে বাইরে আসি—তখনই সে দাঁড়া দুটি বিঁধিয়েছে পায়ের উপর।

আর কেউ জানলো না। দুজন মা ঘুম লেগে গুহার ভিতরে অচেতন।
বৃষ্টি থেমে গেলে পরে কেবল আকাশে দৃষ্টি ফুটে উঠলো
সাতজন ঋষির;
শোয়ানো শরীরটিও দেখা গেল আবছাভাবে—যার থেকে কর্কট কখন
জয়রক্ত খেয়ে গেছে, দেহে লেগে আছে শুধু মুমূর্ষু শিশির!

বন্ধুকে রাত্রির চিঠি

রোমশ জন্তুর মতো এসে বসে থাকি তোর ঘরে।
একদিন বল্লম এসে বিঁধেছিল শরীরে আমার—
তারপর, নিজেকে উপড়ে নিয়ে অন্য কোনো দেহের ভিতরে
বিন্ধ হতে চলে গেছে। আজ এই ক্ষতস্থানে তার

ত্রিকোণ ফলার মুখ যেন ফিরে ফিরে আসে ডুবে যেতে মাংসের গরমে!
নির্জন জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, সারারাত্রি ক্ষরণ, ক্ষরণ…
একদিকে লতার দল ভিজে যায়, অন্যদিকে সেই ক্লেদ ক্রমে
ঝিনুকের মধ্যে গেলে বেড়ে ওঠে কোন বিষ? কার শিশু? সনাক্তকরণ

কখনো সম্ভব হবে? বোধহয় না। 'আজ শুধু এসেছ বল্লম!
শরীর শিউরে তোলো…'অথচ ফলার গায়ে নিচু হয়ে জিহ্বা ছোঁয়াতেই
লেগেছে লবণজ্বালা ক্ষতমুখে! সে তবে আসেনি? তবে সে
ওখানে নেই?
না-ই যদি এসে থাকে তাহলে আমার জিভ কেন এরকম

ফালাফালা হয়ে গেছে? কোন্ তীক্ষ্ন ধারের আঘাতে?
বেঁধানো জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, ক্রমশ ক্ষরিত হয় বিষ…
অথচ আমার সামনে বসে তুই একা একা এখনো ভাবিস
আবার আসবেই কোনো বল্লম, ফলার মুখে আমাকে জাগাতে!

রক্তমেঘ

সে আমাকে রেখে গেছে এই রক্তমেঘ দিয়ে ঢেকে।
যদি কোনদিন তার মনে পড়ে তবে বাতাসের মধ্যে ভেলা
ক্রমশ এগিয়ে আসছে দেখতে পাবো সুদূর আকাশযান থেকে।
দুখানি ফুসফুসে আমি আগুন ধরিয়ে রাত্রিবেলা

দোলাবো আকাশপথে বর্শাফলকের মধ্যে গেঁথে।
যে ভেলা পাঠালো তার দূত এসে শ্বাসযন্ত্র ছাড়া এ শরীর
খুঁজে পাবে একদিন। তাও সেই দূত কিন্তু এমন অল্পেতে
খুশি হতে পারবে না। খুঁজে খুঁজে বাতাসতরীর

ভিতরে সে তুলে নেবে ততটুকু দেহ-অংশ, যার পুরোটাই বায়ুভূত
হয়নি এখনো। আর রোমে রোমে ভরে দেবে শত ছুঁচ, আগুনে টকটকে!
আমিও আবার কাঁপবো বিষ লেগে, আবার এই অবশিষ্ট শরীরের ত্বকে
লাবণ্য জন্মাবে। আর আগে সে যেমন এসে আমার মাথার কাছে শুতো

তেমনই অজান্তে ফের আমার শরীর ঢেকে ঢেকে
সমস্ত পাপড়িগুলি খুলে দেবে। আর আমি বিছানা থেকে উঠেই অন্তত
একবার জানলায় বসবো—দূরে আকাশের গায়ে রক্তমেঘ দেখে
বলবো অবাক হয়ে 'তুমিও কি প্রতিদিন এরকম ভোরবেলা ওঠো?'

শিবির

বন যদি শেষ তবে কে এখানে পেতেছে শিবির ?
কে তবে আগুন এনে জ্বালিয়েছে পরিখার ধারে ?
গাছের ভিতর দিয়ে দেখা যায় টিলার ওপারে
উঠে নেমে গেছে পথ, ঘন ঝোপ দুপাশে নিবিড় ।

তমসা নিজের নাম ধরে একবার ডেকে উঠে
চুপ করে গেল আর টিলা থেকে শুধু একটি ঘোড়া
ঘুরে ঘুরে নামে, তার আরোহী কোথায় করপুটে
ধরেছে রাত্রির ফল, সে জানে না । শুধু এই শিবিরে প্রহরা

দিতে ফিরে আসে রাত্রে জ্বালানো আগুন লক্ষ করে ।
শিবিরে থাকে না কেউ । কেবল তমসা এসে নিজে
আগুন প্রস্তুত করে ডাক দিলে টিলার খোয়াই ধরে ধরে
নামে সে-ঘোড়াটি, যার দুচোখের কোল রক্তে ভিজে !